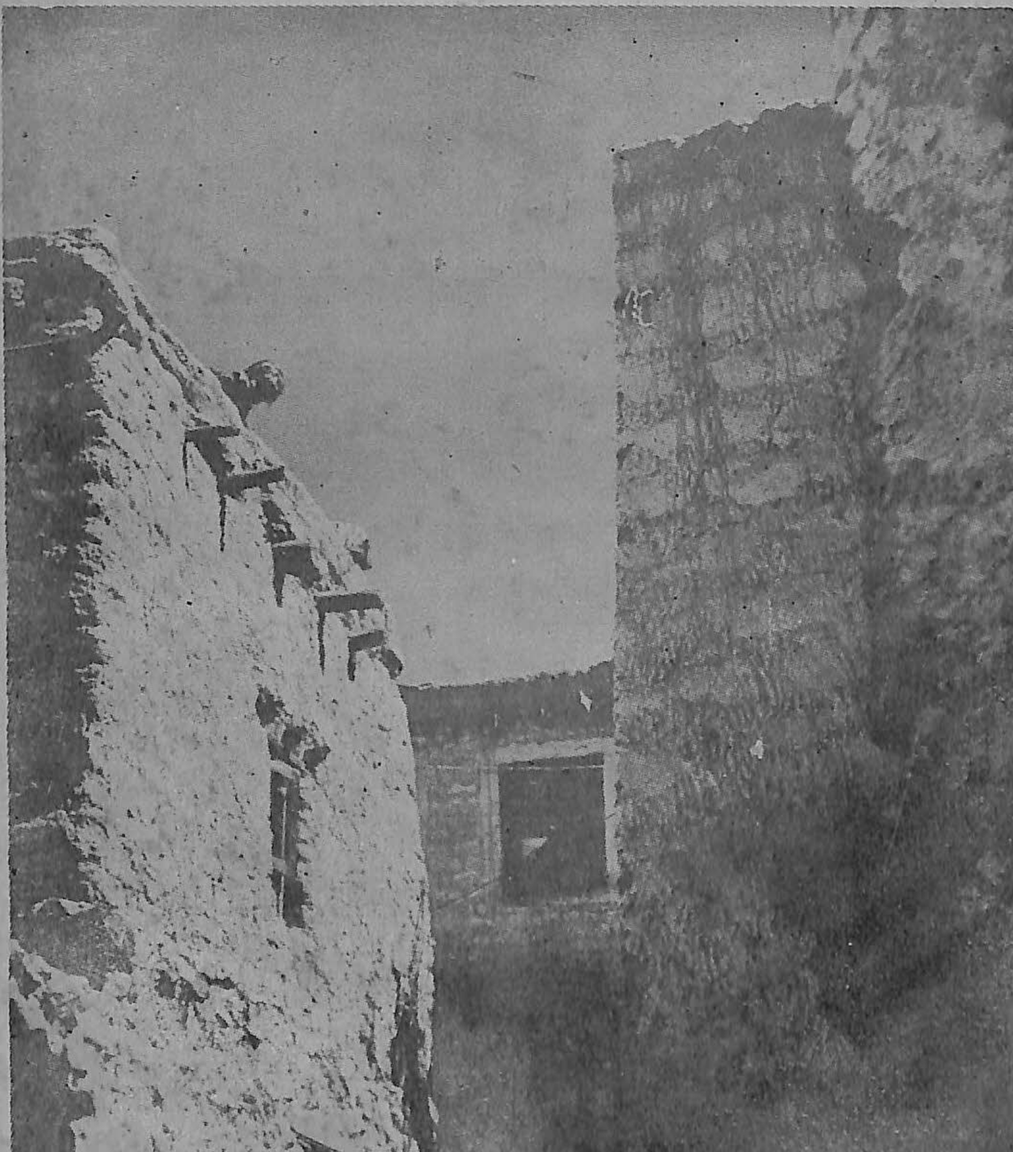
লাদাখের পথে

মালবী গুপ্ত



লাদাখের পথে

মালবী গুপ্ত

ফোটো : অনীশ গুপ্ত

৫৭/২ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৮৫

প্রকাশিকা : মাধবী মণ্ডল

সংবাদ প্রকাশন

৫৭/২ ডি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

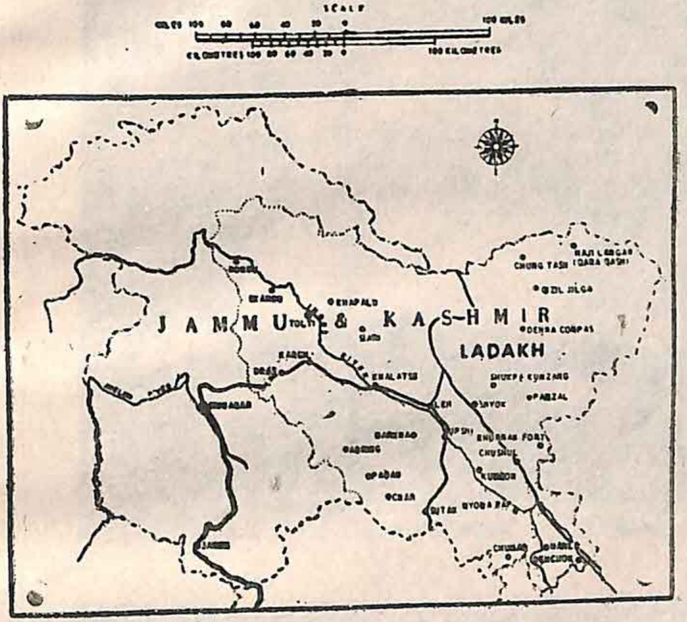
মুদ্রণ : মদন দত্ত

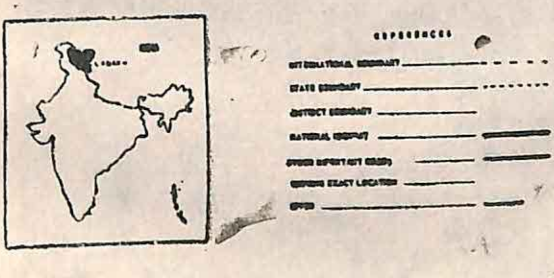
মলয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

দাম : সাত টাকা

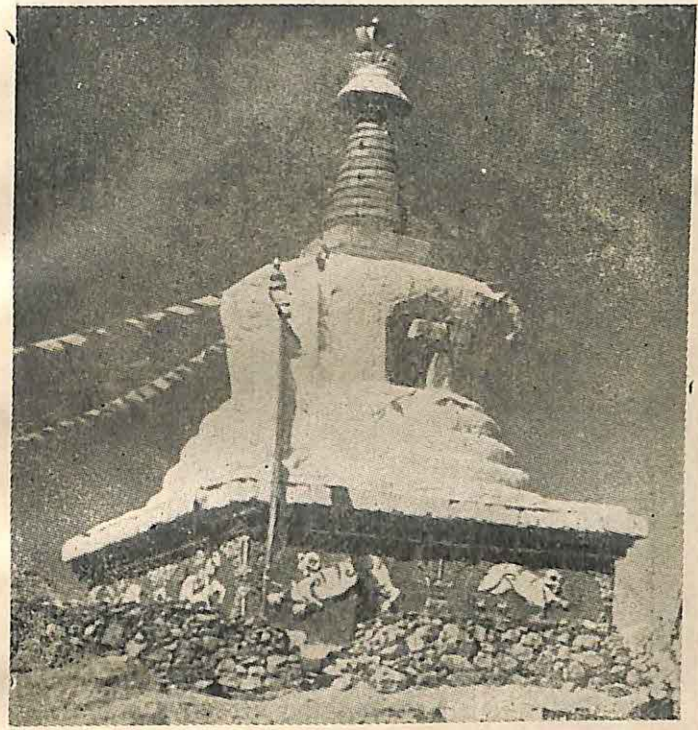
আমার মা শ্রীমতী দীপালি রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

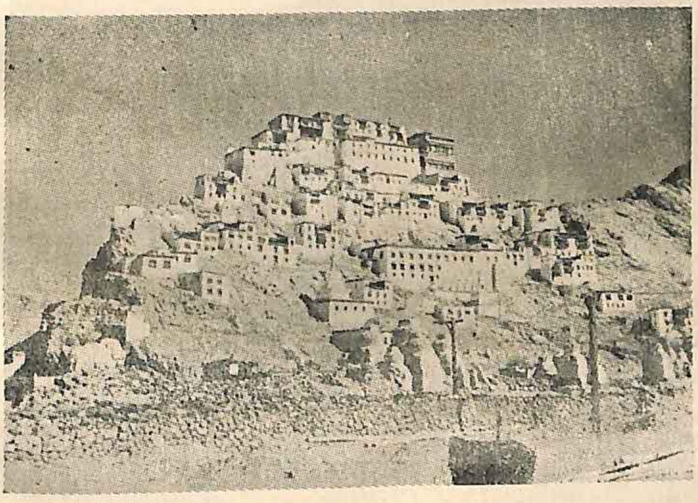
LADAKH
(J & K)-INDIA



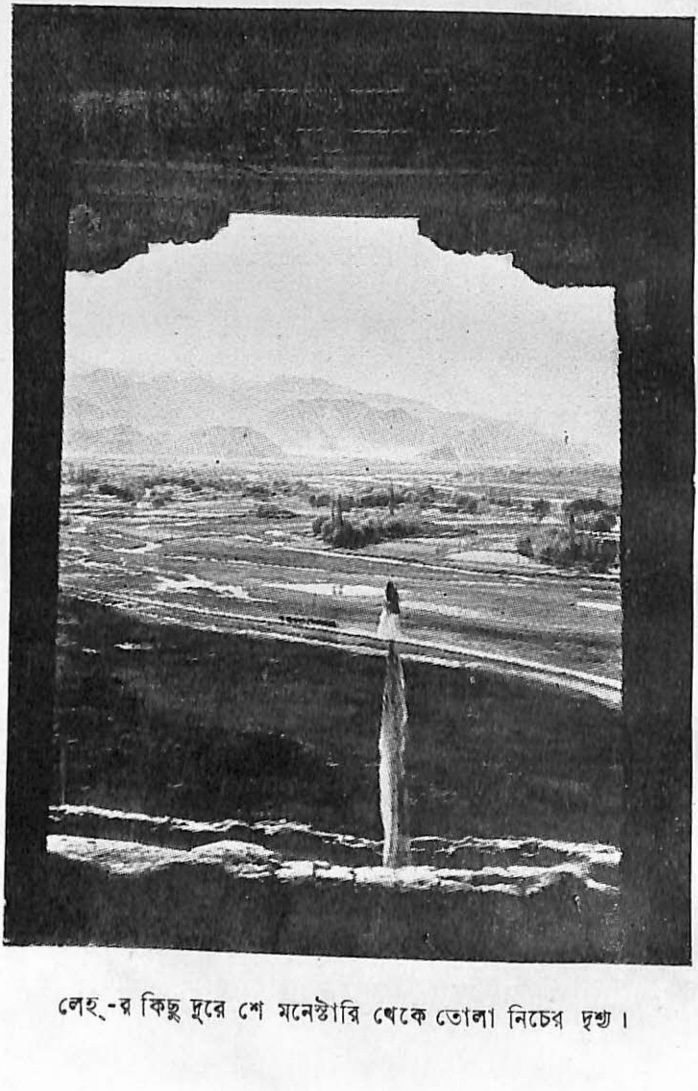


ভারত সরকারের সৌজন্যে





উপরে : লেহ্ শহরের মুখে বৌদ্ধস্তূপ অর্থাৎ চোটেন,
নিচে : থিক্‌সে মনেস্টারি।



লেহ্-র কিছু দূরে শে মনেস্টারি থেকে তোলা নিচের দৃশ্য।



লেহ্-র পথে



লেহ্ শহর। মাঝখানে পোলো খেলার মাঠ।



লেহ্-র রাজপ্রাসাদ



লেহ্ শহরের ভিতরে উল তৈরি হচ্ছে।

লাদাখ নিয়ে কিছু বলা বা লেখার আগে প্রথমেই একটা কথা অনায়াসে বলা যায়, যে লাদাখে সশরীরে পৌঁছনো যে-কোনও ভ্রমণ-বিলাসীর কাছে জীবনের এক পরমপ্রাপ্তি। আর লাদাখ সম্পর্কে পড়ে কিছু জানা লাদাখ-ভ্রমণের স্বপ্ন দেখাকে একটু উজ্জ্বল করা। দেশী-বিদেশী অনুসন্ধানকারী বা পর্যটক যাঁরাই লাদাখে একবার গিয়েছেন, ফিরে এসেছেন যেন পৃথিবীর আর এক নতুন বিস্ময়কে আবিষ্কার করে। যাঁরা প্রকৃতি-প্রেমিক, বিশেষ করে যাঁরা পাহাড়ে যেতে ভালবাসেন, পাহাড় সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই তাঁদের বদলে যাবে, যদি একবার তাঁরা লাদাখের দুর্গম কিন্তু আশ্চর্য-সুন্দর পথে পা বাড়ান।

১৯৮১-র ৪ঠা অক্টোবর সকাল নটায় আমাদের বাস শ্রীনগর শহর ছাড়িয়ে লাদাখের পথে এগিয়ে চলল। উঁচু নীচু পাহাড়া পথের ধারে কোথাও দোকানপাট, কোথাও বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে আপেল বাগান। প্রচণ্ড রকমের উত্তেজনা মনের মধ্যে চেপে চোখ দুটো কাচের জানলার বাইরে মেলে রেখেছিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল লাদাখের রাজধানী লেহ্ শহর। শ্রীনগর থেকে ৪৩৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত এই লেহ্, ক্রমশই বিদেশী পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠছে। লাদাখ মূলত কারাকোরম পর্বতমালার মধ্যেই পড়ে। লাদাখের দুর্গম পাহাড়ী পথে বাস চলাচল করে মাত্র কয়েক মাসের জন্য। কারণ প্রচণ্ড তুষারপাতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় ওখানকার হিমাঙ্ক নেমে যায় মাইনাস চল্লিশ-পঞ্চাশ ডিগ্রিতে। বিমান যোগাযোগই তখন একমাত্র ভরসা। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের জন্যই অক্টোবরের প্রথম দিকেই প্রায় পর্যটনের সময়কাল শেষ হয়ে আসে।

আপেল বাগান থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে বাসের ভেতরের দৃশ্য দেখে বেশ অবাক হলাম। আমরাই একমাত্র বাঙালী পর্যটক। দু একজন স্থানীয় অর্থাৎ শ্রীনগরের বাসিন্দা, আর সব যাত্রী বিদেশী ও বিদেশিনী। তাঁদের কেউ সাংবাদিকতার জন্য, কেউ অনুসন্ধানের কাজে, আবার কেউ নিছক দেশ-দর্শনের কৌতূহলে চলেছেন। ১৯৭৪ সাল থেকেই প্রথম একটু একটু করে পর্যটকরা লাদাখে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তার আগে একমাত্র অনুসন্ধানকারী ছাড়া সাধারণ মানুষ সেখানে যাওয়ার অনুমতি পেত না। মাত্র কয়েক বছর হল লাদাখ তার রাস্তা খুলে দিয়েছে সকলের জন্য। কিন্তু, তার আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালিনী রুক্ষ সৌন্দর্যের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি বেশি। ফলে লাদাখ খুব দ্রুত বিশেষত বিদেশী পর্যটকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় এবং মোহময় এক দ্রষ্টব্য স্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা বাহুল্য আমরাও তার রুক্ষ সৌন্দর্য এবং দুর্গম রহস্যময়তার কথা শুনেই লেহ্‌র পথে পা বাড়িয়ে-ছিলাম।

লাদাখের সুদীর্ঘ পাহাড়ী পথ পেরুতে সময় লাগে প্রায় দুদিন। মাঝপথে কারগিল শহরে এক রাত কাটাতে হয়। দুপাশে আপেল বাগানের মাঝখান দিয়ে সর্পিল পাহাড়ী পথ ধরে বাস চলতে চলতে প্রথম গিয়ে থামে সোনমার্গ উপত্যকায়। যাত্রীরা হাত পায়ের জট ছাড়িয়ে নিয়ে এখানে কিছু খেয়ে টেয়ে নেয়। অনেকে পাঁচ দশ মিনিটের জন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ার শখ মেটায়। শ্রীনগর থেকে বেশ কয়েকটি টুরিস্ট বাস এক সঙ্গে ছাড়ে পাঁচ দশ মিনিট সময়ের ব্যবধানে। আমাদের বাস সোনমার্গে পৌঁছতেই দেখলাম আরো বেশ কয়েকটি বাস আগেই সেখানে পেঁাছে গেছে, পর্যটকরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাস থেকে নামতে না নামতেই দূরের তুষারশৃঙ্গগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটে আসা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ারা প্রায় অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। চারদিকে সবুজ পাহাড়। মাঝখানে সিন্ধু নদীর পাশে এই সোনমার্গ উপত্যকা। পাহাড়ের কোল জুড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে

দূরে তুষারশৃঙ্গ। সিন্ধু নদীর নীল জলরাশি এখানে কিছুটা বা গম্ভীর। ইতস্তত অজস্র ঘোড়া, কাছে-দূরে পাহাড়ের গায়ে ভিন্ন-দর্শন গরু, ভেড়া, ছাগল চোখে পড়ে। রাস্তার দুপাশেই ছোটবড় হোটেলের সঙ্গে লাগোয়া দোকান নানান সুন্দর জিনিসে সাজানো। এই সোনমার্গ পর্যন্তই সবুজ পাহাড় চোখে পড়ে। তারপরই শুরু হয়ে যায় গাছ-পালাহীন রুক্ষ পাহাড়। শেষ নেই, সীমা নেই, অসীম সমুদ্রের মত যেন থমকে আছে তার পাথুরে শরীর নিয়ে।

সোনমার্গ থেকে বাস যতই এগোতে থাকে, চারপাশে পাহাড়ের চেহারাও ততই বদলাতে থাকে। এবড়ো খেবড়ো পাথরের বোল্ডার, বাম্প্‌স ডিঙিয়ে বাস ঘণ্টায় চার পাঁচ কিলোমিটার বেগে উঁচুতে উঠতে থাকে। বেশ কিছুদূর খাড়াই পথে ওঠার পর বাস এসে পড়ে একটু সমতলে 'যোজিলা পাস'-এ। এখান থেকেই শুরু হয় বরফ। এই যোজিলা পাসই একমাত্র শ্রীনগর এবং লেহ্‌র যানবাহনের রাস্তাকে সংযুক্ত করেছে। এই রাস্তা দিয়েই লেহ্‌ শহরের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস শ্রীনগর থেকে যায়। অন্তত গ্রীষ্মের সময় চেষ্টা করা হয় এই 'যোজিলা পাস'এর রাস্তাকে তুষারমুক্ত রাখার। যোজিলা পাস অতিক্রম করে আমাদের বাস একসময়ে দ্রাসে এসে পড়ে। দ্রাসের সমস্ত পাহাড়ই ঘন তুষারে ঢাকা। সব জায়গাতেই সে-তুষারের বয়স দু তিন বছর। তুষার-গলা জলেই কোথাও দু চারটে সবুজ বার্চ বা পপলার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গাঢ় নীল আকাশ, ঝকঝকে সোনালি, কখনও রুপোলি সূর্যের আলো, কোথাও রঙিন, কোথাও তুষারশুভ্র পাহাড়. কোথাও বা সফেন নীল জলরাশির নিরবধি গতিশীলতা, তারই পাশাপাশি গজিয়ে ওঠা এক দল তন্বী শ্যামাঙ্গীর মর্মরধ্বনি—এ সব নিয়ে উজ্জ্বল অবর্ণনীয় দিন এক সময়ে শেষ হয়ে আসে। বিদায়ী সূর্য তার সাত রঙের বিলোল কটাক্ষ হেনে চলে যায় পাহাড়পুরের অগম পারে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। বাস এসে থামে কারগিলে।

লেহ্ যাওয়ার পথে কারগিলে সবাই এক রাতের অতিথি হয়ে আসে। আমাদের বাস যখন কারগিল শহরে এসে থামল, তখন চার-পাশে গাঢ় অন্ধকার। ছোট বড় হোটেলের দূতেরা বাস স্ট্যাণ্ডে ভিড় করে দশ, কুড়ি, চল্লিশ করে ডাকাডাকি করছিল। আমরা যে সময় লাদাখ রওনা হয়েছিলাম, পর্যটনের মরশুম সে সময় শেষ হয়ে এসেছে। তাই অল্প দাক্ষিণাতেই সব জায়গায় খাওয়া-থাকার সুবিধেটুকু পেয়েছিলাম। পরদিন সূর্য ওঠার আগে ভোর পাঁচটার সময় আবার আমাদের নির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু হল। মনে পড়ে, আমরা নির্দিষ্ট বাসে উঠে অধীর আগ্রহে ছাড়ার অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু বাস আর ছাড়ে না। সেদিন প্রায় আধ ঘণ্টা লেগেছিল আগুন জ্বালিয়ে বাসের জমে যাওয়া ইঞ্জিনকে গরম করে তুলতে। এক সময়ে নড়ে চড়ে বাস আবার পথে চলতে শুরু করে।

কারগিল থেকে লেহ্ যাওয়ার পথে মূলবেখ, নামিকালা, হেমিসকূট, ফতুলা, লামায়ারু, খালসে, সাসপল, নেমু ইত্যাদি বেশ কয়েকটি জায়গা পড়ে। লেহ্ যাওয়ার পথে ফতুলাই সব থেকে উঁচু জায়গা, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চোদ্দো হাজার ফিট। বাসের মধ্যে বসে থাকলেও এই ফতুলা দিয়ে যাওয়ার সময় মাথায় একটু চাপ অনুভূত হয়, নিশ্বাস নিতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিও। রাস্তার একদিকে কঠিন পাথুরে দেওয়াল, আর একদিকে বুক হিম-করা কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। যেদিকেই তাকাও পাহাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। রুক্ষ পাহাড়ের কী আশ্চর্য রঙ। সূর্যের সাত রঙ যেন এক একটা পাহাড়ে নেমে এসেছে। পুব দিক ছেড়ে সূর্য যত মধ্য গগনে উঠতে থাকে পাহাড়ে পাহাড়ে তার সাত রঙ ততই গলে গলে পড়ে। কখনও একই পাহাড়ে নীল, সবুজ, বেগুনি, সোনালি, বাদামি রং পাশাপাশি শুয়ে থাকে, প্রকৃতির এ কী অপূর্ব শিল্পকাজ! সমস্ত পাহাড়ী শরীর জুড়ে হাজারো রঙের খেলা। মাঝে মাঝেই যেন খোদাই করা অদ্ভুত সব রোমান স্থাপত্য। প্রকৃতিই যার একমাত্র স্রষ্টিকর্তা। কোথাও দীর্ঘ প্রান্তর জুড়ে সোনালি ঢেউ

যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, কোথাও মনে হয়েছে উষর মরুভূমির বুকে বিশালাকৃতি পিরামিডেরা উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সমস্ত লাদাখ জুড়ে ইনডাসের কলোচ্ছ্বাস। হ্যাঁ, সেই ইনডাস, যার অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সিন্ধু সভ্যতা। ইনডাসকে দেখে কেবলই মনে হয়েছে যেন একদল ঘোড়সওয়ার টগবগিয়ে ছুটছে যুদ্ধক্ষেত্রে। কেবলই ছুটছে, অনলস অবিরাম সে গতিশীলতা। যে থমকে দাঁড়ায় না কখনই, ছোট বড় বাধা ভেঙে ভেঙে কেবলই ছুটে চলে। কত হাজার বছর ধরে সে মানুষকে দিয়েছে জল ও জীবন। আবার মানুষেরই রক্ত বয়ে নিয়ে গেছে সে আরব সাগরে! অনেক ইতিহাস সযত্নে গড়ে তুলেছে, অনেক ইতিহাস দিয়েছে ধ্বংস করে স্বেচ্ছাচারে। কারো কাছে কোন জবাবদিহি নেই, আপন ছন্দে আত্মমগ্ন স্বাধীন ইনডাস। লেহ্‌র পথে যেতে যেতে সব থেকে অবাক হয়েছি যখন দেখেছি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঘোড়ার পিঠে, কিংবা একপাল ভেড়ার পেছনে পেছনে চলেছে সুন্দর লাদাখী মেয়ে-পুরুষ। মাথায় তাদের অদ্ভুত চামড়ার টুপি, পায়ে তেমনই অদ্ভুত জুতো, লম্বা পোশাকের ওপর পিঠে ঝোলানো ছাগলের চামড়া—সব মিলিয়ে মন হাজার হাজার বছর পেছনে হাঁটছিল। নিজেদের মনে হচ্ছিল অন্য কোন দূর দেশের মানুষ। হঠাৎই এসে পড়েছি আর্য অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে।

৫ই অক্টোবর আমরা বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ লেহ্ শহরে পৌঁছোই। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেহ্'র রাজকীয় শীতের অভ্যর্থনায় দাঁতে আর হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যায়। মাত্র কুড়ি টাকায় আমাদের জায়গা জুটে গেল ইয়াকটেল হোটেলে। লেহ্ শহরের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। চারপাশে পাহাড়, আর এক দিক দিয়ে শহরে ঢোকার রাস্তা। এই লেহ্ শহরই হল লাদাখের রাজধানী। একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে লাদাখে তিন ধরনের মানুষ এসে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করেছিল।

তার আগে লাদাখে সাধারণত তিব্বতী যাযাবররাই ইতস্তত ঘুরে বেড়াত। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে একদল মানুষ এসে লাদাখে প্রথম বসতি স্থাপন করে—এরা 'মন' (Mons) নামে পরিচিত ছিল। এরা লাদাখে এসে গ্রাম তৈরি করে, গুম্ফা তৈরি করে। এই 'মন'-রাই লাদাখে প্রথম নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যায়। 'মন'-এর পর পশ্চিম থেকে আসে দর্দরা (Dards)। এরা ইনডাসের তীরে তীরে বসতি গড়ে তোলে। দর্দরাই লাদাখে প্রথম পোলো খেলা চালু করে। লড়াকু হিসেবেও দর্দরা বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রাচীন পাথুরে খোদাই থেকে জানা যায় দর্দরা শিকার করতেও বেশ ভালবাসত। তবে দর্দ এবং মনরা উভয়ই ছিল বৌদ্ধ। লাদাখের যে সব জায়গা চাষের যোগ্য ছিল, সেখানে দর্দ ও মনরা সেচের ব্যবস্থা করে চাষ-আবাদ করত। এরা পাথরের ওপর নানা ছবি খোদাই করে রঙ দিয়ে ভরিয়ে তুলত। শেষে আসে মোঙ্গলরা, দশম শতাব্দীতে।

বর্তমানে লাদাখ ভারতের অন্তর্গত হলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে দীর্ঘকাল সে তার স্বাধীনতা বজায় রেখে চলেছিল। বিভিন্ন সময়ে লাদাখ জম্মু-তিব্বত-চীন-মধ্য এশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু লাদাখীরা সে আক্রমণকে প্রতিহতও করেছিল। পনেরো শতকে থেকেই লাদাখে মুসলমানদের আগমন ঘটেছে বারবার, কখনও শান্তিবাণী প্রচারকের ভূমিকায়, কখনও বিধ্বংসীর ভূমিকায়। মোঘল শাসনকালে শ্রীনগর এবং দিল্লীর মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যে মোঘলরা লাদাখ বার বার আক্রমণ করবে না, যদি সেখানে সুন্নী সম্প্রদায়ের মসজিদ গড়তে দেওয়া হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সতেরো শতকের শেষের দিকে লাদাখের রাজধানী লেহ্ শহরে সুন্নীদের মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। পঞ্চম দালাইলামার আমলে তিব্বত থেকেও মাঝে মাঝেই আক্রমণ চলেছে লাদাখের ওপর। এবং সেই সময় থেকেই লাদাখের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হতে থাকে। লাদাখ লাসা প্রশাসনের কাছেই শুধু হেরে যায় না, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের প্রতিবেশী

মুসলমান রাজ্যের অনবরত হানাদারিতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। জম্মুর শাসনকর্তা গুলাব সিং-এর আমলে ১৮৪৬-এ লাদাখ তার স্বাধীনতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্গত হয়ে যায়।

মধ্যপ্রাচ্য ও তিব্বতের মধ্যে যে সুপ্রাচীন ব্যবসাপথ ছিল, যে পথ দিয়ে ঘোড়া, খচ্চর আর ইয়াকের পিঠে চড়ে সভ্যতা-বিনিময় হয়েছিল কয়েক হাজার বছর ধরে, সেই পথের ধারে তিব্বতের তলদেশে লেহ্ ছিল সর্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি যদিও লেহ্ তখনও আত্মস্থ করেনি। প্রকৃত অর্থে লেহ্ ছিল একটি বড় ধরনের গ্রামবিশেষ। তবুও এশিয়ার যে কোন মানচিত্রে লেহ্ নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। এই শহরের দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে ইনডাসের দুরন্ত জলোচ্ছাস। শহরের আর একদিকে প্রায় তার মাথার ওপর পাহাডের গায়ে বেশ কয়েক'শ বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ। তিব্বতের রাজধানী লাসার বিখ্যাত প্রাসাদ পোতালার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য এই লেহ্‌র রাজপ্রাসাদের। একশ দেড়শ বছর আগে লেহ্ শহরের চেহারাটা যেমন ছিল, আজও মনে হয় প্রায় তেমনই রয়ে গেছে। মানুষজনের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। ইন্‌ডাস নদীর দুপাশে সবুজ শস্যক্ষেত আর পুরনো শহরের বাড়িগুলো বদলায়নি একটুও।

দুর্গম পাহাড়ী পথ পেরিয়ে আধুনিক সভ্যতার দূতেরা যে লেহ্‌তে এসে পৌঁছায়নি তা নয়। শহরে বাজারের মাঝখানে পোস্ট অফিস এসেছে, টেলিগ্রাফের তার বসেছে, পুরনো শহরকে একপাশে রেখে উপত্যকার অপর প্রান্তে গড়ে উঠেছে সৈন্যবাহিনীর ক্যাণ্টনমেণ্ট, কয়েকটি উচ্চমানের হোটেল, বাড়ি আর একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। যার যান্ত্রিক শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে যায় বহু দূরে। আর যার উৎপাদনে প্রতি সন্ধ্যায় বিজলি আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে লেহ্ শহর। কিন্তু শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে

আধুনিক সভ্যতা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। শহরে আধুনিক কালের নিদর্শন খুবই বিরল। একালের পর্যটকদের কাছে লেহ্ শহরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাই এক প্রাচীন জগতকে হঠাৎই আবিষ্কার করার মত রোমাঞ্চকর।

সীমান্ত শহর বলেই বোধহয় লেহ্'র চারপাশে মিলিটারি ব্যারাক। এবং সারাদিনই পাহাড়ী রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে হাজারও মিলিটারি কনভয়ের গমনাগমন চোখে পড়ে। শহরের ঘরবাড়ি, হোটেল, দোকানপাট সবই পাহাড়ের কোলে কোলে ছড়ানো ছেটানো। শহরের সমস্ত পথই তাই উঁচু নীচু। আমাদের ইয়াক্‌টেল হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালেই দুচোখ জুড়ে বাদামী পাহাড়। হোটেলের গা দিয়েই এক ক্ষীণ জলধারা পাথরে পাথরে শব্দ তুলে নিয়ত প্রবহমান। হোটেলে আমাদের তদারকিতে ছিল সতেরো আঠারো বছরের এক লাদাখী যুবক, গোলাম নবী। দুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে টগবগে তেজী ঘোড়ার মতই যার চলাফেরা। সন্ধ্যের পর গোলাম নবী আমাদের 'হিলটপ্' রেস্টুরেন্টে পৌঁছে দেয় খাওয়াদাওয়ার জন্য। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে আসি। আব্‌ছা আলোয় ঘরের ভেতরের সব কিছু অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়। দেওয়াল জুড়ে ড্রাগনের নানান ছোট বড় স্ক্রোল, কাঠের মেঝেয় ড্রাগন আঁকার লাল কার্পেট। টেবিলে মোমের আলো। কাচের জানলার বাইরে সাদা জ্যোৎস্নায় বিধৌত লেহ্ শহর যেন ক্রমেই হয়ে ওঠে প্রচণ্ড রহস্যময়ী। হিলটপ্ ছেড়ে পথে নেমে দেখলাম রাস্তার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যই দোকানপত্র তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই লেহ্ শহরে গভীর রাত নেমে আসে। ঝোড়ো হাওয়া আর কাছে দূরে জলপ্রবাহের দ্বৈতসঙ্গীত লেহ্ শহরের ঘুমপাড়ানি গান হয়ে তখন পাহাড়ে পাহাড়ে টহল দিয়ে ফিরতে থাকে।

পরদিন খুব সকালেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। হোটেলের

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি পাহাড়ের ঘুম তখনও ভাঙেনি। চারপাশে যেন হাল্কা সাদা ধোঁওয়ার মত অস্পষ্ট কুয়াশার চাদর বিছানো। ধীরে ধীরে সূর্য উঠল। তার সোনালি রং পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশ নামতে লাগল নীচের দিকে। পরিষ্কার নীল আকাশ ধীরে ধীরে চোখ খুলল। সকাল হল। শীতকে কব্জা করার জন্য পোশাকে-আশাকে আমারা আরো কিছু ওজন বাড়িয়ে লেহ্ শহরকে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম পথে। ইন্ডাস উপত্যকার তৃণহীন ধূসর রুক্ষ প্রান্তরে লেহ্ হল এক মাত্র জীবন্ত মরূদ্যান। যেখানে তুষার গলা স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারার মতই প্রাণের কলরোল ছড়িয়ে পড়ে সহস্র হাজার বছরের নিষ্প্রাণ কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর তামাটে, সোনালি কিংবা তুষারশুভ্র পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে।

পাঁচশ কিলোমিটার দূরের কৈলাস থেকে নেমেছে ইন্ডাস নদী। ইন্ডাস উপত্যকার পাহাড়গুলির গায়ে এমনকি ইন্ডাসের কোল ঘেঁসে পাহাড়ের যে ঢাল নেমে এসেছে সেখানেও কোনও গাছের চিহ্ন নেই। ঝোপঝাড় এমনকি ঈষৎ শ্যাওলাও চোখে পড়ে না কোথাও। খরস্রোতা নদীর জলের আঘাতে আঘাতে পাথর গুঁড়ো হয়ে তৈরি হয় বালি। তীব্র ঝোড়ো হাওয়ায় সে বালি উড়ে গিয়ে নানা জায়গায় সৃষ্টি করে বালিয়াড়ি। প্রবহমান ইন্ডাসের দু পাশের বিস্তীর্ণ ঐ অঞ্চলকে তাই বলা হয় 'ইন্ডাস মরু।'

শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম অজস্র দোকানপাট। রকমারি উলেন পোশাক, ছোট বড় নানা নক্সার হাতে-তৈরি কার্পেট, রুপো এবং নানান রঙিন পাথরের সুন্দর অলঙ্কার, উজ্জ্বল রঙের সুন্দর ছবি আঁকা সিল্কের স্ক্রোল (স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলে টঙ্কা), বিভিন্ন ধাতুর মুখোস ইত্যাদি হাজারো জিনিসে সাজানো। কার্পেটে দেখলাম ফুল, লতাপাতার তুলনায় ড্রাগনের নক্সাই বেশি। রাস্তার দুপাশে ফুটপাত জুড়ে রোজই ছোটোখাটো বাজার বসে কপি, গাজর, মুলো, আলু,

শালগম, শাক এবং আপেল নিয়ে। মাছ বা ডিমের তেমন চল নেই। ডিম আসে শ্রীনগর থেকে। তাই দামও বেশ বেশি। ভেড়া বা ছাগলের মাংসই প্রধান। শহরের মধ্যে খাওয়ার জল তত সহজ-লভ্য নয়। সবাইকেই এক দেড় কিলোমিটার নেমে গিয়ে দূরে মিলিটারি ব্যারাকের কাছাকাছি থেকে জল সংগ্রহ করে আনতে হয়। সবাই জল আনে পিঠে করে টিনের পাত্রে। রাস্তাঘাটে এই জল আনার দৃশ্য সারাদিনই চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে অবাক হয়েছি ওরকম ভারি জলের পাত্র পিঠে নিয়ে অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়েরাও কথা বলতে বলতে অবলীলায় পথ হেঁটে চলেছে।

শহরের একদিকে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যার বেশির ভাগই ভবিষ্যতে হোটেল ইত্যাদি তৈরি হবে। পুরনো শহরের বাড়িগুলো সবই প্রায় পাথর মাটি এবং কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠ সস্তা বলে তার ব্যবহারও বেশি। ইঁটের ব্যবহার তেমন নেই। কাঁকুরে মাটি দিয়ে লোকেরা হাতে হাতে ইঁট কিছু বানায় এবং রোদে শুকিয়ে নেয়। পুরনো শহরের ঘরবাড়িগুলো প্রায় একশ দেড়শ বছরের পুরনো এবং খুবই ঘিঞ্জি। দেখতে অদ্ভুত রহস্যময়। কোন কোন বাড়ির প্রবেশ পথ কেমন অন্ধকার গুহার মত যার মাটি থেকেই হঠাৎ যেন সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। জানলার ব্যবহারও কম। বাইরে থেকে ঘরের ভেতর তাই প্রায় অন্ধকার মনে হয়। সরু সরু গলি, ঠিক গলি বললেও ভুল হয়। উঁচু-নীচু পাথরের পায়ে চলা পথ। যেন খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। হঠাৎ হঠাৎই সে পথের ওপর দিয়ে ক্ষীণ কোন জলধারা ছলছল করতে করতে বয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে মধ্যযুগীয় কোন আরব শহরের দৃশ্যপট মনে ভেসে উঠছিল। শহরের অলিগলিতে ব্যস্তসমস্ত লাদাখী মেয়ে-পুরুষ, প্রকৃতির মতই সুন্দর চেহারা তাদের। আর অদ্ভুত প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল হাসিখুশি। মেয়েদের হাত সব সময়ই কোন না কোন উল বোনায় ব্যস্ত। খুব অল্পবয়েসী মেয়েদের হাতেও কাঁটা আর উল চোখে পড়ছিল। নিজেদের মধ্যে

গল্প করতে করতে রোদে পিঠ দিয়ে বয়স্কারা হাতে হাতে উল তৈরি করছিলেন।

সকাল থেকে বিকেল অবধি লেহ্ শহরের রাস্তায় রাস্তায় যেন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। ছোট পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে বোঝাই হয়ে জ্বালানি চলেছে এদিক ওদিক। মেয়েরা শুকনো কাঠ মাথায় করে নিয়ে চলেছে। হাঁক ডাক তুলে ভেড়িয়ালরা ভিড় ঠেলে ঠেলে তাড়িয়ে নিচ্ছে ভেড়া আর বিশাল লোমওয়ালা ছাগলের পাল। বেলা তিনটে পর্যন্ত জোরালো রোদ থাকে। তারপর থেকেই সূর্য যত পশ্চিমে হেলে, বাতাস তত তীক্ষ্ণ ও ঝোড়ো হয়ে ওঠে। শহরের বাজারে সারাদিনের কেনা বেচার পর বেশ খুশির মেজাজ নিয়ে সবাই বাড়ির দিকে রওনা হয়। বড় বড় বোতল ভর্তি 'ছাঙ' (স্থানীয় মদ) হাতে ফেরে ছেলেরা। মেয়েরা মাথায় পরে নেয় রঙবেরঙের পাথরখচিত চওড়া ঝুলন্ত চামড়ার টুপি—যাকে ওরা বলে 'পরাখ'। পথ চলতে চলতে মেয়েরা উচ্চস্বরে কথা বলে। কারণ তাদের কান পর্যন্ত ঢাকা টুপি শ্রবণশক্তির বিঘ্ন ঘটায়। দিনের শেষ বাস কয়েকটিতে ভিড় হয় খুব। দূরের গ্রামগুলি থেকে যারা উপার্জনের তাগিদে লেহ্‌তে এসেছিল তারা ভিড় করে বাসগুলিতে। পায়ে দড়ি-বাঁধা সঙ্গের ভেড়া বা ছাগলগুলোকে তুলে দেয় বাসের মাথায়। তারপর সূর্য পশ্চিমের পর্বতমালার আড়ালে চলে গেলে, এই প্রাচীন শহরে প্রাচীনতর জীবন-প্রবাহে ক্রমে ভাঁটা পড়ে আসে।

লেহ্ শহরের চারপাশে যে সমতলভূমি রয়েছে, সেখানে সবুজের বেশ সমারোহ। ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরনার জলকে চাষের কাজে লাগানো হয়। লাদাখে বৃষ্টির তেমন বালাই নেই। সারা বছরে তিন চার ইঞ্চির বেশি নয়। তাই বরফ গলা নদীর জলই একমাত্র ভরসা। তাও গ্রীষ্মের কয়েকটা মাসের জন্য। তারপর শীত এলে তাপমাত্রা নামতে নামতে −৫০°-তেও গিয়ে পৌঁছয়। তখন ঐ খরস্রোতা ইনডাসও জমাট বরফ হয়ে নিশ্চল হয়ে যায়।

শহরের বাজার থেকে কিছু আপেল কিনে নিয়ে আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামের সন্ধানে হাঁটা দিলাম। সকাল তখন একটু করে দুপুরের দিকে ঝুঁকছে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখে আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দোকানের পেছন দিকের বারান্দায় গিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসলাম। দোকানের মালিক আমাদের ব্ল্যাক টি তৈরি করে দিলেন। তিনি প্রথমে আমাদের 'বাটার টি' অফার করেছিলেন। কিন্তু এমন নাম আগে কখনো শুনিনি। এবং মাখন দিয়ে চায়ের ব্যাপারে জিভের আস্বাদন ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ায় শেষ অবধি 'বাটার টি'তে আর রাজি হওয়া যায়নি। তবে তাঁর মুখে শুনলাম লাদাখে 'বাটার টি' অত্যন্ত প্রিয় পানীয়। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে দোকানের মালিক আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দোকানে চা, বিস্কুট, লজেন্স থেকে ডিম, টকদই, চাপাটি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। দোকান থেকে ওঠার আগে আমরা তাঁর কাছে জেনে নিলাম জলতেষ্টা পেলে লাদাখী ভাষায় কী বলব। বলা বাহুল্য কিছুদূর এগোতে না এগোতেই অনায়াসে সেই শব্দ ভুলে গেলাম। প্রকৃত যখন জল তেষ্টা পেল তখন মুখ থেকে পানি ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি।

গ্রামের বাড়িগুলো একটু দূরে দূরে। বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া খামার। আমরা যে সময় গেছি সে সময়ে ফসল কাটা হয়ে গেছে। খামারে খামারে মাড়াইয়ের কাজ চলেছে। বেশির ভাগ জায়গায় দেখলাম মাড়াইয়ের কাজ হচ্ছে গাধা বা জো দিয়ে। বলদ ও ইয়াকের সঙ্করই হল জো। জো দেখতে অনেকটা গরুর মতই। তবে গায়ে বড় বড় লোম আর লম্বা চুলওয়ালা লেজ। কোন কোন খামারে মহিলাদেরও কাজ করতে দেখলাম। মাড়াই করা শস্যের খোসা হাওয়ায় উড়িয়ে পরিষ্কার করছেন। মহিলারা একটানা সুরে গান গেয়ে গেয়ে খামারের কাজ করেন সারাদিন। পথ চলতে চলতে বহুদূর থেকেও আমরা সেই প্রলম্বিত গানের সুর শুনতে পাচ্ছিলাম। দীর্ঘ ছ'সাত

মাস লাদাখ বরফের চাদরের নীচে ঢাকা পড়ে থাকে। নভেম্বর থেকে শীত শুরু হয়ে যায়। জমাট বরফের নীচে সমস্ত লাদাখ যেন তখন ঘুমিয়ে থাকে। মে মাস থেকে ঐ বরফ গলতে শুরু করে। দীর্ঘ একটানা ঘুমের পর যেন একটু একটু করে জেগে ওঠে সে। ইয়াক্ বা জো নিয়ে লাদাখী চাষীরা মাঠে নেমে পড়ে। গম আর যবই ওখানে প্রধান ফসল। তার সঙ্গে নানা শাক সবজি। চাষের জন্য যখন ওরা মাঠে কাজ করে তখনও সারাদিন ধরে ওরা গান গেয়ে চলে। লাদাখী পুরুষ মহিলা উভয়ই এক সঙ্গে চাষের কাজ করে। ছেলে মেয়েরা সেখানে খাবার পৌঁছে দেয়। সারা দিনের পর সন্ধে নামার আগেই বাজারে মানুষজনেরা ভিড় করে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। সন্ধ্যের পর তারা বেশিক্ষণ জেগেও থাকে না, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানির অভাবে।

লেহ্ শহরের যত্রতত্র মন্দিরের মত দেখতে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ বা চৈত্য চোখে পড়ছিল। স্থানীয় ভাষায় এই স্তূপকে বলে 'চোটেন'। চোটেনগুলির গায়ে নানা রঙের জীবজন্তুর ছবি আঁকা কোথাও বা খোদাই করা। বৌদ্ধ ধর্মে পুজোর সমর্থনেই ঐ চৈত্য বা স্তূপ তৈরি হয়েছিল। এই চোটেনকে বৌদ্ধ ধর্মে অবতার কল্পের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই চোটেনের গঠন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের এক প্রতীকী অর্থের সাযুজ্যের কথা বলা হয়। স্থানীয় লোকদের মতে, রাজার আমলে কেউ অন্যায় কাজ করলে শাস্তি হিসেবে অপরাধীদের গায়েগতরে খেটে ঐ স্তূপ তৈরি করে দিতে হত। বছরের বিশেষ সময় ঐ সব স্তূপে পুজোও হয়ে থাকে।

ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার জন্যই প্রচণ্ড রোদেও হাঁটতে কোন ক্লান্তি বোধ হয় না। তবে উঁচু নীচু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শ্রীচরণদ্বয় একটু কাহিল হয়ে পড়ে। আমরা তাদের একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসলাম। হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি

তিন সুন্দরী লাদাখী বালিকা। প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে ঝুড়ি ছিল। আমাদের কাঁধে ক্যামেরা দেখে ছবি তুলে দেবার আবেদন জানালো। কথায় কথায় জানালো ওরা আমাদের বাজারে আপেল কিনতে দেখেছে। আমরা কোথা থেকে গিয়েছি শুনে তারা বলল—কলকাতার নাম তারা শুনেছে। কথায় কথায় তাদের অজস্র হাসি ঝরে পড়ছিল। অবশ্য লেহ্-র সমস্ত মানুষজনকেই সব সময়ে হাসিমুখ দেখেছি। ঝকঝকে নির্মল হাসি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্যে সবাই যেন টগবগ করছে। দেখে মনে হয় দুঃখের সৈনিকরা লাদাখে পরাজিত।

লেহ্ শহরের সবচেয়ে দ্রষ্টব্য স্থাপত্যটি হলো সেখানকার চারশো বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে শহরের শিয়রে যেন অতন্দ্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশাল রাজপুরী। রাজকীয় জাঁকজমকে এক সময় এই প্রাসাদের ঘরগুলি গমগম করত। ভিনদেশ থেকে আসতো নানান রাজা মহারাজার দূত, আসতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। প্রাসাদের চুড়োর ওপর লাদাখ সাম্রাজ্যের পতাকা ঝড়ো হাওয়ায় উড়ত পত-পত করে। প্রাসাদের সেই জৌলুস এখন বিলুপ্ত। ফাটল ধরেছে প্রাসাদের প্রাচীরে। ছাদ ধসে পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক ঘর। দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে দুর্মূল্য সব ফ্রেস্কো, জ্বালানি হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দারুশিল্পের কত বিরল নিদর্শন। এই প্রাসাদ এখনও রাজ-পরিবারেরই সম্পত্তি। এমন কি রাজতন্ত্রের শেষ পরিচিত উত্তরাধিকারী, রাজা কুংসাঙ নামগেয়াল বেঁচে থাকাকালেও রাজপরিবার ঐ প্রাসাদেই বসবাস করে গেছে। দেশ বিদেশে একসময় লেহ্‌র এই রাজপ্রাসাদ প্রচুর খ্যাতি লাভ করলেও, বর্তমানে তার ঐ ভগ্নদশার জন্যই পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আর কারো প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অসংখ্য চোটেনকে পাশ কাটিয়ে যখন ঐ রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে ওপরে উঠছিলাম, তখন 'হ্যালো' 'হ্যালো' শুনে এদিক ওদিক তাকাতেই এক এক জায়গায় তিন চারটি করে লাদাখী

শিশুকে খেলতে দেখছিলাম। নুড়ি মাটি নিয়ে আপন মনে খেলছে, আর বিদেশী পর্যটক দেখলেই কচি কচি গলায় হাসিমুখে 'হ্যালো' বলে মিষ্টি সম্বোধন করছে। বাস্তবিকই উভয় পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও ঐ 'হ্যালো' আর হাসি ছাড়া অন্য কিছুই বিনিময় করা যায় না। এক হাজার খ্রীস্টাব্দেই তিব্বতী ভাষা-সংস্কৃতি লাদাখেরও ভাষা সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই থেকেই পশ্চিমী উপভাষা হিসেবে তিব্বতী ভাষা লাদাখীদের কথ্য ভাষার রূপ নিল যা আজও লাদাখী ভাষা বলে প্রচলিত। তবে লাদাখী ভাষা বলে কোন দিনই কোনও স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। লদাখের সমস্ত সাহিত্যই তিব্বতী ভাষাতেই লেখা হয়েছে এবং আজও হয়। ভাষা সম্পর্কিত সরকারী মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তারা লাদাখী ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই বেশি আগ্রহী। অপর পক্ষে তির্ব্বতী ভাষার সঙ্গে লাদাখী ভাষার মিল নিতান্তই যৎসামান্য বলে মনে করা হয়। এমন কি মনেস্টারিতে যে সমস্ত তিব্বতী বই বা পাণ্ডুলিপি আছে, সেগুলোকেও ভারতীয় অফিসাররা লাদাখী বই বলেই উল্লেখ করেন। স্কুলগুলোতেও হিন্দি এবং উর্দু ভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। তিব্বতীকে ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করার মাত্র সুযোগ থাকে এবং তিব্বতী নামের বদলে সেই ভাষার নাম হয়ে যায় 'বোধিক'। যে ভাষায় লাদাখীরা কথা বলে তার প্রতি অকারণ এই সরকারী অবহেলা পরোক্ষে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

অল্পবয়েসী লাদাখীদের সঙ্গে, যারা বিশেষ করে স্কুলের মুখ একটু আধটু দেখেছে, হিন্দিতে দু চার কথা চালানো যায়। কিন্তু বয়স্ক বা খুব বাচ্চাদের সঙ্গে মোটেই কথা বলা যায় না। ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তবে একটা জিনিস লক্ষ করেছি। অত ঠাণ্ডা এবং বিশুদ্ধ বাতাসের জন্যই বোধহয় ক্লান্তি বেশিক্ষণ থাকে না। হোটেলে গোলাম নবী আমাদের প্রয়োজনমত গরম জল জুগিয়ে গেছে। কিন্তু সে জল দ্রুত

ঠাণ্ডা হতেও সময় লাগেনি। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল গোলাম নবীর বাড়ি আসলে দ্রাসে। সে এই হোটেলের ট্যাকসি চালাতো। কিন্তু কিছু দিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করায় নিজেও বেশ জখম হয়েছিল, আর গাড়িও। গাড়ি তখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। তাই ও এখন প্রায় বেকার। পর্যটনের মরশুমও শেষ হয়ে এসেছে। হোটেলগুলো সব প্রায় ফাঁকা। ঐ অসময়ে আমাদের পেয়ে সে বেশ একটু কাজ পেয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার রাস্তায় নেমে এলাম। উল্টো দিকে অর্থাৎ হোটেলের বাঁ-হাতি ঢালু পথে চলতে শুরু করলাম। সূর্য তখন দ্রুত চলে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপারে। তার লালচে আভা ক্ষণিকের জন্য মুকুটের মত পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে থাকছে। তারপর দ্রুতই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফিরে সে দৃশ্য দেখে নিচ্ছি। হঠাৎই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন আমরা বাঙালী কিনা। আমাদের উত্তর শুনে নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আর একটু এগিয়েই আমার 'সোনাম' হোটেল। চলুন না আলাপ করা যাবে কিছুক্ষণ। হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের চা খাওয়ালেন। আর নিজের জীবনের অজস্র গল্প বলে চললেন। আগে উনি মিলিটারিতে চাকরি করতেন। পরে কোনও কারণে চাকরি ছেড়ে হোটেলের ব্যবসা করেন। এবং লাদাখী মেয়ে বিয়ে করেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বড় মেয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। দারুণ সুন্দরী সে মেয়ে, নাম তার 'সোনাম' (তার নামেই হোটেল)। আদর করে রবীন্দ্রনাথবাবু তাকে ডাকেন 'সোনার পুতলী' বলে। নাম তার সত্যিই সার্থক। দীর্ঘকাল তিনি, এই লেহ্‌তে আছেন। লাদাখী ভাষায় অনর্গল কথা বলে যান ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রনাথবাবুকে দেখে তাঁর কথা শুনে খুবই অবাক হচ্ছিলাম। ঐ প্রচণ্ড দুর্গম পথ পেরিয়ে চারপাশে তুষারের রাজ্যে, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় যেখানে বাঙালীরা এক সপ্তাহের জন্যও বেড়াতে আসার সাহস সঞ্চয়

করতে পারে না, লেহ্‌র টুরিস্ট বাসে যেখানে আমরা একজনও ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর সাক্ষাৎ পাই না, সেখানে কোন্ সুদূরের রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, লাদাখী মেয়ে বিয়ে করে ঘর বিছিয়ে সংসার পেতেছেন, ব্যবসা ফেঁদেছেন হোটেলের। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

তাঁর হোটেলের ব্যবসা কেমন চলে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—মরশুমের সময় খুবই ভালো চলে। আমরা যে ঘরে বসেছিলাম, সেই ঘর উনি বিদেশীদের কাছে একশ কুড়ি টাকা ভাড়ায় দেন। বাঙালী পেলে অবশ্যই কিছু কম করেন। অন্তত কয়েক দিনের জন্য নিজের দেশের মানুষের সঙ্গ পাওয়ার আনন্দে, মাতৃভাষা বলতে পারার সুখে, তাঁর এই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই ক্ষমা করা যায়। হোটেলের ঘরগুলির ভেতরের চেহারা প্রায় একই রকম। কাঠের মেঝে আপাদ-মস্তক মোটা কার্পেটে ঢাকা। কাচের জানলায় ভারী পর্দা, একবার সরালেই বাইরে দূরের বাদামি, সোনালি পাহাড়শ্রেণী চোখের পলকে ঘরের মধ্যে চলে আসে। ঘরের এক কোণে 'ফায়ার প্লেস'। দুটি করে খাট, ছোট্ট টেবিল চেয়ার, ড্রেসিং টেবিলে সাজানো সুন্দর ঘর। খাবার দাবারের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই আছে, কারণ দোতলায় উঠতেই বিরাট ডাইনিং টেবিল চোখে পড়েছিল। এই হোটেলেই ওঁর ঘর সংসার। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী নিয়ে এখানেই থাকেন। রবীন্দ্রনাথবাবু লাদাখীদের নিয়ে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথাও বলতে লাগলেন। যেমন, লাদাখীরা ভীষণ শান্তিপ্রিয়। সব ধর্মের লোক মিলেমিশে থাকে। জাতপাতের গণ্ডগোল নেই। রাজনীতির তেমন লড়াই নেই। একজনের বিপদে অন্যজন প্রাণ দিয়ে করে। সবচেয়ে বড় কথা, চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে লেহ্ প্রায় মুক্ত। প্রত্যেকে খুবই বিশ্বাসী। ভাবা যায় এমন দেশ আজও পৃথিবীতে আছে।

রবীন্দ্রনাথবাবু জানালেন—এ বছরই তাঁরা প্রথম দুর্গাপুজো করছেন

লেহ্‌তে। শুনে অবাক হবারই কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এগারো বারো হাজার ফুট উঁচুতে যেই কিছু বাঙালী একত্র হয়েছে, অমনি তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব পালনের আনন্দে মেতে উঠেছে। জানালেন, বহু লাদাখী লোকজনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে চাঁদা দিয়েছেন। ঠাকুর দেখার জন্য খুব ভিড়ও হচ্ছে। গান বাজনাও চলছে। সে নাকি এক দারুণ ব্যাপার।

আমাদের প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে চললেন। লেহ্‌তে তখন সন্ধে নেমেছে। অলিগলি রাস্তায় যেখানে বিজলি আলো পৌঁছয় না, অন্ধকার সেখানে ঘনিয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারির পথ হাতড়ে প্রায় জ'মে যাওয়ার মত ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঝোড়ো হাওয়া আর ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ি ঝোরার গান শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথবাবুকে অনুসরণ করে একসময়ে পূজোর জায়গায় পৌঁছে যাই। ধূপ-ধুনোর গন্ধ, পুরোহিতের উচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ আর একদিকে কাওয়ালীর জমাটি আসর, সব নিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। আশপাশ থেকে বহু লাদাখী লোকজন ভিড় করে সেই পুজো দেখতে এসেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে নবমীর আরতি চলছে তখন।

মি. সেনগুপ্ত বিভিন্ন ধরনের জীবিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। সবাই প্রায় বাঙালী আর কলকাতার লোক। কর্মসূত্রে সবাই এই দূরদেশে আছেন। অনেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। অনেকে পারেননি। গ্র্যাণ্ড ওবেরয়-এর ম্যানেজার মি. চৌধুরী, মিলিটারির মি. চক্রবর্তী, ক্যাপ্টেন আচারিয়ার মত বহু লোকের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল। আমাদের সঙ্গে কথায় বার্তায় অনেকেই বহুদিন পর যেন স্বজন-সঙ্গলাভের আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন। কেউ কেউ ফেলে আসা বাড়ি-ঘর আত্মীয়-পরিজনের কথায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন।

সীমান্ত শহর হলেও মিলিটারিদের যত্রতত্র যাতায়াত লেহ্‌র সরল জীবনযাত্রায় কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। কী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে,

কী মানুষের অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে এমন দেশ বোধহয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তবে অনেকেরই আশঙ্কা লেহ্‌, ক্রমশ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে, তাই হয়তো আগামী দশ বছর পরই এর চেহারা অনেক বদলে যাবে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের রূপও বদলাতে থাকবে।

সুন্দরী কুমারী লেহ্‌ যেন দিনের শেষে রোজ ইন্‌ডাসের নীল জলে মুখ দেখে—তার সযত্ন লালিত কৌমার্যকে আর কতদিন সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কে জানে। মাঝে মাঝেই পাহাড়ে পাহাড়ে যেন ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে ওঠে সুন্দরী লেহ্‌। তার অতুল ঐশ্বর্যের খবর পৌঁছেছে পৃথিবীতে, তাই তো দূর দেশ থেকে মানুষ আসছে তারই ঐশ্বর্য-সন্ধানে।

বহু যুগ আগেই বেশির ভাগ লাদাখী যাযাবর-জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসে মনোযোগী হয়েছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আড়াই হাজার, চার হাজার মিটার উচ্চতায় লাদাখীরা অনায়াসে বাস করতে পারে। আর পশুপালকদের কুঁড়ে দেখা যায় পাঁচ হাজার মিটারেরও ওপরে। তবে চার হাজার মিটার উচ্চতার পর থেকে অক্সিজেনের একটু অভাব ঘটে। সাধারণভাবে দেখা গেছে লাদাখীরা দীর্ঘায়ু হয়। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সাহেব বেশ কিছুকাল লাদাখে কাটিয়েছিলেন অনুসন্ধানের কাজে। একশ বছর বয়সেরও বেশি অনেক লাদাখীদের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন।

লাদাখের জনসংখ্যা এতই কম, দেখা গেছে প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র দুজন লাদাখী বাস করে। নৃতাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানবিদের মতে বিগত একশ কুড়ি বছরের মধ্যে লাদাখের জনসংখ্যায় বিশেষ কোন তারতম্য ঘটেনি অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়েওনি, কমেওনি। দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে লাদাখে জন্ম মৃত্যুর সমান হার বজায় থেকেছে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রান্তে জনসংখ্যা যখন হু হু করে বেড়ে চলেছে, এমন কি সমস্ত তৃতীয় বিশ্বও

যখন ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতির চাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন লাদাখের জনসংখ্যার এই স্থিতাবস্থা আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে। অবশ্য এর পেছনে লাদাখী সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-কাজ করে।

প্রথম দেখা যায় লাদাখীদের জীবনের ওপর ধর্মের একটা গভীর প্রভাব রয়েছে। ফলে বহু নরনারী স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বুদ্ধের উপাসনা ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-কাজই তাদের জীবনের একমাত্র-উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আজীবন অবিবাহিত থেকে যান। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার একটা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তার থেকেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে লাদাখী সমাজের বিবাহ ব্যবস্থা। পঞ্চস্বামী গ্রহণ মহাভারতে দ্রৌপদীর জীবনেই থেমে থাকেনি। মহাকাব্যের যুগ ছেড়ে এই রীতি পদ্ধতি আজও ভারতবর্ষের দু একটি প্রদেশে টিকে আছে। উত্তরপ্রদেশের কোন এক পার্বত্য অঞ্চলে আজও এই প্রথা চালু আছে। লাদাখী মেয়েদেরও একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। একটি পরিবারের বড় ছেলের স্ত্রী, লাদাখী সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তার অন্য ভাইদেরও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ সেই মেয়েটিকে দেওরদেরও স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। আমাদের জিপ ড্রাইভার হুসেনের মুখেও এই অদ্ভুত বিবাহ রীতির কথা শুনেছিলাম। হুসেন বলেছিল, এখন অবশ্য এই রীতি কিছুটা শিথিল হয়ে আসছে। লাদাখে এই পলিয়্যান্ড্রি বা বহুবল্লভ প্রথা চালু হওয়ার পিছনে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। আবহাওয়ার জন্য চাষ আবাদের কাজ বেশ কঠিন ছিল। তাই পরিবারগুলোও ছোট ও সীমিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির এই প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে লাদাখীরা চালু করেছিল এই বিবাহ প্রথা। যার ফলে পরিবারের আয়তন স্বাভাবিক ভাবেই ছোট হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথাতেই সম্পত্তিরও বিভাজন ঘটত না অর্থাৎ পরিবারটি যৌথ থেকে গেলে, জমি জমা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগাভাগি হত না। লাদাখের

ঐ প্রচণ্ড প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে পারিবারের সব জমিজমা ভাগ করে আলাদাভাবে চাষ-আবাদ-করে জীবন ধারণ করা প্রায় তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে সম্প্রতি এই রীতি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। কারণ লাদাখী যুবক যুবতীরা মনোগেমাস বা একস্বামী গ্রহণরীতির প্রতিই আকৃষ্ট হচ্ছে। তার কারণ পরিবারগুলো আর আগের মত শুধুই জমি নির্ভর নয়। শ্রীনগর লেহ্‌র প্রধান সড়ক খুলে যাওয়ায় লাদাখের অর্থনীতিতে কিঞ্চিৎ গতির সঞ্চার ঘটেছে।

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই লাদাখে ইয়াক্ আর লাঙলের আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং তারপর কয়েক'শ বছরের মধ্যেই তারা সেচের ব্যবস্থাকে মোটামুটি উপযোগী করে তুলেছিল। প্রথম দিকে লাদাখীরা শুধুই চাষ আবাদ করত। পরে তারা ব্যবসার ক্ষেত্রেও মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু অত উঁচু উপত্যকার লোকজন বিনিময়ের ক্ষেত্রে টাকার ব্যবহার করত না। জিনিস দিয়েই ব্যবসার বিনিময় চলত। যেমন চাষীরা উল দিয়ে বীজ. কাপড়, মসলা ও চিনি জোগাড় করত। নুনের ব্যবসাও তারা শিখেছিল পরে। আর পশুপালকরা মাখন দুধের পরিবর্তে নীচের উপত্যকা থেকে কিনে নিয়ে যেত চা।

এখনও লাদাখীদের বেশির ভাগই কৃষিজীবী। কিছু লোক হস্তশিল্পী, আর কিছু সংখ্যক হলো পশুপালক সম্প্রদায়ভুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন চার পাঁচ হাজার মিটার ওপরে পাহাড়ী উপত্যকাগুলোতে লাদাখীরা কঠিন শ্রমে, দীর্ঘ অধ্যবসায়ে গড়ে তুলেছে ছোট ছোট গ্রাম এবং লেহ্‌র মত শহর। গ্রীষ্মকালে সমতলের ভারতবর্ষ যখন প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যায়, সূর্যের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির নীচে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, তখন লাদাখের পাহাড়ে পাহাড়ে একটু একটু করে গলতে শুরু করে সাদা বরফ। তখনই ভেড়া ছাগল আর ইয়াকের পাল নিয়ে পশুপালকের দল দুর্গম গিরিপথ পেরিয়ে উঠে যায় সদ্য তুষার মুক্ত মালভূমির দিকে। প্রতি বছরই শীতের সময় তারা নেমে আসে নীচে। শীত-শেষে উঠে যায় ওপরে। খুঁজে নেয় চারণভূমি।

আর নীচের লাদাখীরা অপেক্ষা করে থাকে আরো বেশি মাখন এবং পশমের আশায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিমালয় ও কারাকোরমের মধ্যের এই সব উপত্যকাগুলি খুবই উর্বর। অবশ্য যত উঁচুতে ওঠা যায় জমির উর্বরতা ততই বাড়ে। কিন্তু চার হাজার সাড়ে চার হাজার মিটারের ওপরে গেলে নিশ্বাসের অসুবিধে হয় অক্সিজেনের অভাবে।

চাষের কাজে লাদাখীরা সাধারণত ইয়াকই ব্যবহার করে। ইয়াক্ মাখন ও দুধের প্রয়োজনও মেটায়। লাদাখীদের ঘর তৈরির কাজে ইয়াকের গোবর প্রায় অপরিহার্য। এর মাংসও খাওয়া যায়। শিঙ্ দিয়ে তৈরি করা হয় পানীয় পাত্র। লাদাখীদের জীবনযাত্রায় ইয়াকের গুরুত্ব তাই সব থেকে বেশি। লেহ্র পথেঘাটে, খামারে মাঝে মাঝেই এই ইয়াকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। চেহারায় আকৃতিতে ভয় পাওয়ার মতই। কিন্তু স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছিলাম ইয়াক্ এমনিতে খুবই শান্ত প্রাণী। সব থেকে খাড়াই পথেও প্রচুর বোঝা পিঠে নিয়ে ইয়াক অবলীলায় হেঁটে যেতে পারে। একশ কেজি ওজন এরা অনায়াসে বহন করে। মজার কথা, জল না পেলে বরফ চিবিয়ে এরা তেষ্টা মেটায়। লাদাখে ইয়াক, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, খচ্চর, জো, এসব ছাড়াও নেকড়ে, হরিণ, তুষারচিতা এবং বুনো ভেড়াও দেখা যায়।

পাহাড়ী রাস্তা যানবাহনের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়। তবে ঘোড়ায় করে যাতায়াতের খুবই চল আছে দেখলাম। চাষআবাদ লাদাখে কোন কালেই খুব একটা বেশি কিছু হত না। এক সময়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল বাণিজ্যকেন্দ্রিক। বাণিজ্যপথ ছিল তিব্বতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভারত-তিব্বত সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই বাণিজ্যপথও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে লাদাখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি সবই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে এর গভীর প্রভাব পড়ে। লাদাখীরা ভেড়া, ছাগল, গরু, গাধা, ইয়াক সবই পালন করে। ভেড়া এবং ছাগলের পালন প্রচুর, মূলত মাংস এবং উলের জন্য।

উল তৈরি করা ও বোনায় লাদাখীরা খুবই পারদর্শী। ঘরে বসে এ কাজ প্রায় সবাই করে। লেহ্ শহরের সর্বত্রই আমরা দেখেছি রোদে বসে বয়স্কা মহিলারা উল তৈরি করছেন। এক জায়গায় বসে বা পথ হাঁটতে হাঁটতে ছোট বড় মেয়েরা দ্রুত উল বুনে চলেছে।

লাদাখীরা শীতের জন্যই অনেকগুলো পোশাক এক সঙ্গে পরে। সবচেয়ে ভালো পোশাকটি তারা সব পোশাকের নীচে পরে এবং সব থেকে পুরনো পোশাকটি পরে ওপরে। গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লাদাখীদের পোশাকে ঢাকা থাকে। মাথায় থাকে ভেড়ার চামড়ার টুপি। পায়ে থাকে অদ্ভুত ধরনের জুতো। ছাগল বা ভেড়ার চামড়া, রঙিন কাপড়ের টুকরো, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে নিজেরাই সেই সব জুতো তৈরি করে নেয়। লাদাখীদের পোশাকের ব্যবহারটাও আশ্চর্য ঠেকে। হাতের লম্বা হাতা অনেক সময় তাৎক্ষণিক রুমালের কাজ করে। শার্ট, ট্রাউজার বা কোটে কোনদিন জল পড়ে না। কিন্তু কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ভালো পোশাক পরতে হলে সাধারণভাবে পোশাক পরার রীতিটাকে বদলে নেয়। অর্থাৎ ভেতরের পোশাকটাকে বাইরে পরে নেয় ওপরেরটাকে ভেতরে। প্রধান লামার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে গেলেও তারা কখনো কখনো পোশাক ভাড়া করে নেয়। লাদাখীদের মধ্যে স্নান করার প্রচলন খুব কম। সাধারণত প্রচণ্ড ঠাণ্ডাই এই ব্যবস্থা চালু রেখেছে। বৃদ্ধরা কোনদিনই স্নান করে না। অল্পবয়েসীরা করে কদাচিৎ। লাদাখী মেয়েরা সাধারণত নানান রঙিন পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর অলঙ্কার ব্যবহার করে। লেহ্ শহরের প্রধান রাস্তার পাশে বহু দোকানে খুব সুন্দর সেই সব অলঙ্কার সাজানো আছে দেখেছি। কিন্তু অলঙ্কারের গায়ে আঁটা লেবেলে দামের গুরুগম্ভীর সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকিয়ে বেশি এগনোর সাহস হয়নি আর।

লাদাখীদের চেহারায় মোঙ্গলদের প্রভাব খুব বেশি। গালের হাড়গুলো একটু উঁচু, থুতনিটা ছোট, নাক ঈষৎ চ্যাপটা এবং চোখগুলো হয় সরু ও তির্যক। গায়ের রং হলদেটে ফর্সা। সাধারণ উচ্চতার

শক্তপোক্ত চেহারা এদের। তবে লাদাখে বহু জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাই চেহারাতেও তাদের বৈচিত্র্য আছে। অনেকের আবার খুব কাটাকাটা নাক চোখ মুখ দেখা যায়। চোখ কারো নীল, কারো বাদামি আবার কারো বা কালো। এক কথায় সুন্দর দেখতে লাদাখের প্রকৃতির মতই যেন তাদের সৌন্দর্য।

বার্লি লাদাখীদের প্রধান খাদ্য হলেও নুডলস তাদের খুব প্রিয় খাবার। তবে নিজেদের জন্যই তারা বাড়িতে নুডলস তৈরি করে। কখনই বাইরে বিক্রি করে না। তাই বোধহয় লেহ্ শহরের 'হিলটপ্' রেস্টুরেন্টে খাদ্যের তালিকায় কখনই নুডলসকে অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়নি। আমরা দুপুর বা রাতের খাওয়া রুটি-মাংস দিয়েই চালাতাম। লাদাখীরা প্রচুর পরিমাণে চা পান করে। তবে আমাদের মত দুধ চিনি সহযোগে নয়। চায়ের সঙ্গে মাখন, সোডা, নুন ইত্যাদি মিশিয়ে খায়, কদাচিৎ দুধও। উৎসব অনুষ্ঠানে নানারকম মাংস খাওয়ার রেওয়াজ আছে। পানীয় হিসেবে ছাঙ্ তাদের সব থেকে প্রিয়। বার্লি থেকে এই ছাঙ্ তৈরি হয়। লাদাখে ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, ইয়াক্, জো-র সঙ্গে সঙ্গে কুকুর বেড়ালকেও গৃহপালিত হিসেবে দেখা যায়। তবে মুরগির প্রচলন একদম ছিল না। কারণ বৌদ্ধধর্মে এক অন্ধ বিশ্বাস ছিল মুরগির ডিম খেলে মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এখন এ ধারণা কিছু শিথিল হয়েছে। হোটেল রেস্টুরেন্টে পর্যটকদের প্রাতরাশে পাউরুটি মাখনের সঙ্গে ডিমের কোন অভাব হয় না এখন।

লাদাখীদের কঠিন জীবনযাত্রায় ধর্মীয় আচরণবিধির খুব কড়াকড়ি থাকলেও খেলা তাদের জীবনে অত্যন্ত প্রিয় বিনোদনের এক বস্তু। এবং খেলা নিয়ে তারা রীতিমত অনুশীলনও করে। লাদাখীদের মধ্যে একটি চলতি প্রবাদ আছে 'খেলা ছাড়া কাজ নুনহীন খাবারের মতই বিস্বাদ'। বহু যুগ আগে দর্দরা গিলগিট্ থেকে যে পোলো খেলা লাদাখে নিয়ে এসেছিল, ক্রমে সে খেলা এমনই জনপ্রিয় হয়েছে যে এখন

তা লাদাখের জাতীয় খেলায় উন্নীত হয়েছে। আগে লেহ্‌র প্রধান সড়কেই এই খেলা চলত। তবে এখন চারপাশের দোকানপাটের চাপে পোলো খেলার জায়গা স্থানান্তরিত হয়ে শহরের বাইরে চলে গেছে। গরিব লাদাখীরাও অনায়াসে এই পোলো খেলার আনন্দটুকু গ্রহণ করার সুযোগ পায়। কারণ লাদাখে প্রত্যেকেরই ঘোড়া আছে। গাছের ডাল কেটে নিয়ে হকি স্টিক বানিয়ে নিলেই চলে।

পোলোর মতই তীর ধনুকের খেলাও লাদাখীদের খুবই প্রিয়। বসন্তকালে জমিতে বীজ বোনার আগে সাধারণত এই খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। লেহ্‌র খেলার মাঠটিই লাদাখে সব থেকে উল্লেখযোগ্য, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার সাতশ মিটার উঁচুতে এই মাঠ। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম গল্‌ফ ক্লাবও এই লেহ্‌তেই অবস্থিত।

অবাক লাগে লাদাখের ঐ জমাট তুষারের প্রাণহীন প্রকৃতির রাজ্যে লাদাখীরা কী করে এতো প্রাণবন্ত উচ্ছল টগবগে তেজী ঘোড়ার মত হয়। প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হলেও লাদাখীরা মোটেই উৎসববিমুখ নয়। নাচ গান লাদাখীদের অত্যন্ত প্রিয় আমোদপ্রমোদ। নাচের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিরই বিশেষ অর্থ আছে। নাচের মধ্যে নাটকীয়তা এত বেশি থাকে যে, যে কোনো দর্শক তা দেখে অনায়াসে নাচের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারে। লাদাখে মুখোশ নাচের খুব প্রচলন আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে লামারাও মুখোশ-নৃত্যে অংশ নেন।

লাদাখীদের চরিত্রের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এরা খুব হাসিখুশি, সৎ এবং কর্মঠ হয়। আর এদের শান্তিপ্রিয়তার কথা আমরা প্রবাসী বাঙালীদের মুখেই শুনেছিলাম। ধর্মনিরপেক্ষতা বা সহিষ্ণুতার দিক থেকেও লাদাখ এক আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। কোনো কোনো পরিবারে এমনও দেখা যায় যে তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় যদি হয় বৌদ্ধ, তো পরের জন হল মুসলমান এবং শেষের জন খ্রীস্টান। তবে লাদাখে বেশির ভাগই বৌদ্ধ। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া সম্প্রদায়ই বেশি। কারগিলে

জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ মুসলমান হলেও লেহ্‌তে অর্ধেক মুসলমান এবং অর্ধেক বৌদ্ধ।

প্রায় বিস্মৃত কাল থেকেই লাদাখে চিকিৎসাবিদ্যায় মনেস্টারিগুলো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে তাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসংক্রান্ত নানান বিধি পদ্ধতির কথা লেখা আছে। এবং তার ওপর নির্ভর করেই লাদাখের সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি আজও টিকে আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় সেই চিকিৎসা পদ্ধতিকে আমাদের খুবই আদিম ব্যাপার স্যাপার মনে হবে। কিন্তু লাদাখীদের কাছে তার প্রাধান্য এখনও অটুট আছে।

সেই সব লাদাখী ডাক্তারদের কাঁধে থাকে একটি ঝোলা ব্যাগ, যার মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের নানান সাজসরঞ্জাম, গাছগাছালি থেকে সংগ্রহ করা নানান ওষুধ, জড়িবুটি—সব মিলিয়ে বিচিত্র সব ওষুধের উপকরণ। একটু বয়স হলেই বাত লাদাখীদের আক্রমণ করে বসে। সেটা অবশ্য আমাদের দেশে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বাতহীন ঠাকুমা দিদিমা তো কল্পনাই করা যায় না। এমন কি অল্প বয়সেও আজকাল অনেকেই বাতে কাবু হয়ে পড়ে। পাহাড়ী দেশে চড়াই উৎরাই পথ হাঁটুর ওপর আঘাত হানে সব চেয়ে বেশি। তাই বাতের প্রকোপ লাদাখীরা হাঁটুতেই বেশি অনুভব করে। ডাক পড়লে ঝোলা কাঁধে ডাক্তার রোগীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। হাঁটু টেপে, চোখ দেখে, জিভ পরীক্ষা করে। ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে নাড়ি টিপে ধরে। তাদের মতে নাড়ি টিপে সমস্ত রহস্যই উদ্‌ঘাটন করা যায়।

আমরা চোখে না দেখলেও স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছি সে এক মর্মান্তিক ক্রিয়াকাণ্ড। গাঁটের ব্যথা সারানোর জন্য লোহা পুড়িয়ে শরীরের নানা অঙ্গে ছেঁকা দেওয়া হয়। তাতেই নাকি ব্যথার নিরাময় হয়।

তিব্বতের রাজধানী লাসাতে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছেছিল সপ্তম শতাব্দীতে রাজানুকূল্যে এবং সেই সময় থেকেই দেশের বিভিন্ন অংশে তা ছড়িয়েও

পড়েছিল। ৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতে পুরনো রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলে রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা পশ্চিম তিব্বতে অর্থাৎ লাদাখে চলে আসেন এবং বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

কুষাণ রাজত্বকালে রাজাদের আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম লাদাখে পৌঁছলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। লাদাখে আবিষ্কৃত অষ্টম শতাব্দীর কিছু পাথরে খোদাই কাজের ওপর প্রাক্ তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যা মূলত ভারতীয় ঘরানার প্রভাবপুষ্ট। কথিত আছে বিদগ্ধ তিব্বতী পণ্ডিত অনুবাদক ও স্থপতি রিন্-চেন্-জাং পো (৯৫৮-১০৫৫) নাকি লাদাখের বহু মনেস্টারি তৈরি করেছিলেন। নিয়ার-মা মনেস্টারিটি তাঁর তত্ত্বাবধানেই তৈরি এবং একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই আলচী মনেস্টারিও তৈরি হয়েছিল।

লাদাখকে কথায় বলা হয় "ল্যাণ্ড অফ্ মনেস্টারিস"। ১৯৭১ সালের সেনসাসে দেখা গেছে সমস্ত লাদাখে পনেরো থেকে সতেরো হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছেন। মনেস্টারিগুলো তাঁদের উপসনার কেন্দ্র। কিন্তু পর্যটকদের কাছে ঐ মনেস্টারিগুলির আকর্ষণ অন্য কারণে— মনেস্টারগুলিতে বহু শতাব্দী আগে আঁকা বা খোদাই করা দেওয়ালের প্রাচীন শিল্পকর্ম। পাহাড়ের গায়ে পাথরের তৈরি বিশাল আকৃতির ঐ বাড়িগুলো হয়ে থাকে প্রকৃতিরই এক স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছোট বড় মিলিয়ে সমস্ত লাদাখে কত যে মনেস্টারি আছে তার বুঝি সীমা সংখ্যা নেই। প্রাচীন কিছু মনেস্টারি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে নিয়ার-মা মনেস্টারিটি একদমই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমাদের হোটেলের গোলাম নবী একটি জিপ ঠিক করে দিয়েছিল আশপাশের কয়েকটি মনেস্টারি দেখার জন্য। এই জিপগুলোকেই ওরা বলে ট্যাক্সি। লেহ্‌তে এমন অনেক ট্যাক্সি সারভিস চালু আছে। আমাদের জিপ ড্রাইভারও ছিল এক লাদাখী মুসলমান। হুসেন। এই হুসেনের মুখ থেকে লাদাখীদের সম্পর্কে বেশ কিছু কথা জানা গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের উৎসব অনুষ্ঠান, সমাজের বিবাহ রীতি,

খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি নানা কথা। এক উজ্জ্বল সকালে আমরা জিপে গিয়ে উঠলাম। আমরা ছাড়াও এক সাউথ ইণ্ডিয়ান পরিবার ছিল। সঙ্গে তাঁদের বছর আড়াই তিনের এক শিশু। কর্মসূত্রে তাঁরা শ্রীনগরে থাকেন। ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। শ্রীনগরে লাদাখ লেহ্ সম্পর্কে এত শুনেছেন যে, ছুটি পেতেই বেরিয়ে পড়েছেন।

যাই হোক আবার সেই খাড়াই পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। রাস্তার একদিকে পাহাড়ের দেওয়াল আর একদিকে কখনও ডানদিকে কখনও বা বাঁয়ে সেই ইন্ডাস নদী ও উপত্যকা। দূরে দূরে তুষারের মুকুট-পরা পাহাড়শ্রেণী। লেহ্-র মত এত গাঢ় নীল আকাশ আর কোথাও দেখিনি। মাঝে মাঝে সাদা হালকা মেঘেরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। লেহ্র উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের ওপর খোদাই করে তৈরি হয়েছিল শে'র দুর্গ। শে'র সব থেকে গৌরবময় যুগে ঐ দুর্গ-প্রাসাদের জাঁকজমক লেহ্র রাজপ্রাসাদের সমতুল্য ছিল। শে'র সামনে বহুযুগ আগে একটি কৃত্রিম হ্রদ ছিল। অবহেলার জন্য পরে সেই হ্রদ ক্রমে জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এই দুর্গপ্রাসাদের মধ্যেই শে' মনেস্টারি। জিপ একসময়ে পাহাড়ের নীচে এসে থামল। বেশ খাড়াই পথ ধরে পাথরের সিঁড়ির ধাপ দিয়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা যখন ওপরে উঠলাম, তখন দম প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। বেলা তখন সকাল দশটা। চারপাশে ঝলমলে রোদ, গাঢ় নীল আকাশ। দুর্গপ্রাসাদের একপাশেই গুম্ফা। বড় বড় উঁচু নীচু পাথরের টুকরো কোথাও কোথাও সিঁড়ির কাজ করছে। গুম্ফার ছাদে উঠে দূরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে ইন্ডাস উপত্যকা। বহু নিচে কালো সরু পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোন পাহাড়ের আড়ালে। এক পাল ঘোড়া নিয়ে চলেছে কোনো লাদাখী পুরুষ। রাস্তারও বহু দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই ইন্ডাসের নীল জল। জলাভূমির আশেপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত। আমরা নীচে নেমে এলাম। গুম্ফার চত্বরের একপাশে একজন লামা চামড়ার

এক অদ্ভুত-দর্শন বাদ্যযন্ত্রের ওপর বাঁকানো মোটা কাঠি দিয়ে দম্‌দম্‌ করে আওয়াজ তুলছেন। তার সেই গম্ভীর আওয়াজ সমস্ত দুর্গ চত্বরে গমগম করে প্রতিধ্বনি তুলছে। আমরা পাথরের উঁচু ধাপ অতিক্রম করে গুম্ফার ভেতরে প্রবেশ করলাম। ঠিক মাঝখানে প্রায় দোতলার সমান উঁচু বিশাল এক প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি। মূর্তিটির সামনে আর একজন লামা বা বৌদ্ধভিক্ষু এক অদ্ভুত ভাষায় জোরে জোরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে চলেছেন। মূর্তিটির চারপাশে ছোট ছোট অসংখ্য 'বাটার ল্যাম্প' (মাখনের প্রদীপ) জ্বলছে। সৌন্দর্যের দিক থেকে ততখানি না হলেও এই মূর্তিটির উচ্চতাই প্রধান আকর্ষণ মনে হয় দর্শনার্থীদের কাছে। ঘরের ভেতরের সমস্ত দেওয়ালে বুদ্ধের নানান ভঙ্গিমার রঙিন ছবি আঁকা ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে ঐসব প্রদীপের ধোঁয়ায় গাঢ় অন্ধকারের নিচে তারা ঘুমিয়ে আছে। আমরা দেশলাই জ্বেলে ওপরের দিকের ছবিগুলো আবিষ্কারের বহু চেষ্টা করছিলাম দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে। কিছু ছবির অস্পষ্ট আভাস ছাড়া স্পষ্ট কিছুই উদ্ধার করতে পারিনি। গুম্ফার ভেতরের ঐ অন্ধকার, লামার বিচিত্র ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ঐ বিশাল বুদ্ধের মূর্তি, গমগমে শব্দ—সব মিলিয়ে যেন এক রহস্যময় পরিবেশ।

এই শে' দুর্গের চারপাশে বহু চোটেন বা বৌদ্ধস্তূপও আছে। শে' থেকে মাত্র চারশ মিটার দূরে পাশাপাশি অনেকগুলি চোটেন আছে। এবং আশ্চর্যের বিষয় তাদের মধ্যে একটি চোটেনে তথাগতের অজস্র মূর্তি সংগ্রহ করে রাখা আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং বিভিন্ন সময়ে এইগুলি সংগ্রহ করে এমন সুন্দরভাবে সাজানো আছে যা সত্যি খুবই প্রশংসনীয়। তবে এদের বয়সকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। দ্রাসে একটি বুদ্ধমূর্তি আছে, যার সময়কাল অষ্টম শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এটিই লাদাখের প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি।

শে'র পরেই আমরা রওনা হয়েছিলাম হেমিস গুম্ফার দিকে। জিপ

থেকে নেমে কাঁকর এবং পাথরের লাল রাস্তা ধরে এগোলাম। রাস্তার বাঁ পাশে পাহাড়ের গায়ে অজস্র গাছ, ডানদিকে উঁচু নিচু অসমতল খালি জায়গা ছোট বড় পাথরখণ্ডে সমাচ্ছন্ন। দূরের পাহাড়গুলোর চুড়ো সাদা তুষারে ঢাকা। গাছের নিচে হলুদ শুকনো পাতা পড়ে আছে অজস্র। পথের ধারে বসে আছে এক বৃদ্ধা ভিখারি যার বয়সের গাছপাথর আন্দাজ করা কঠিন। মুখের মধ্যে একটাও দাঁত নেই। অসংখ্য বলিরেখায় মুখের মানচিত্র নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে আমরা তাকে দেখলাম, ছবি তুললাম তার। সে হাত নেড়ে অনেক কিছু বলেছিল। কিন্তু ভাষা তার অতিক্রম করতে পারিনি। শুধু তার মুখে মিষ্টি ও তার হাতের ইঙ্গিত দেখে বুঝতে পারছিলাম, সে পয়সা চাইছে মিষ্টি কিনে খাবে বলে। লাদাখে থাকাকালীন ঐ বৃদ্ধা ছাড়া আর কোন ভিখারি আমার চোখে পড়েনি।

একটু খাড়া পথে উঠে গিয়ে হেমিসের পাথরের চাতাল। চাতালের ডানদিকে মনেস্টারির বাড়ি। বাঁদিকে দীর্ঘ টানা খোলা বারান্দা। বারান্দার ছাদে খুঁটির ওপর ভর দিয়ে দোতলায় অসংখ্য ঘর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার দেওয়াল জুড়ে বুদ্ধের নানান ভঙ্গিমা ও বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অজস্র রঙিন চিত্র। তন্ত্র মহাযানে যে সব হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন কালী, অবলোকিতেশ্বর (শিব) যম ইত্যাদির ছবি চোখে পড়ল। হেমিস গুম্ফায় কাচের আলমারিতে কয়েকশ বছরের পুরনো জীর্ণ পাণ্ডুলিপি থরে থরে সাজানো আছে দেখলাম। অদ্ভুতদর্শন দেওয়ালচিত্র সম্পর্কে লামাদের বারবার প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। প্রশ্নকর্তাদের প্রতি তাদের যেন এক স্বাভাবিক ঔদাসীন্য থাকে। কিছুটা বা সন্দিগ্ধও। সন্দেহের কারণও আছে। কিছুদিন আগে এই হেমিস গুম্ফা থেকে চুরি হয়ে গেছে মহামূল্য বুদ্ধের মূর্তি। গুম্ফার ভেতরে এক বিরাট হলঘরে আমরা বুদ্ধের ছোট বড় নানান মূর্তি দেখেছিলাম। মূর্তিগুলো মূল্যবান ধাতুর, কোনটি বা সোনার। এখন মূর্তিগুলো দেখার সময় খুব কাছাকাছি

যাওয়া যায় না। চারপাশে রেলিং দেওয়া আছে। এই ঘরটিতে বিশাল বিশাল কাঠের থাম, থামের গায়েও নানান খোদাই কাজ। দেওয়াল জুড়ে তন্ত্র মহাযানের নানান সব ছবি। ঘরের চারপাশে খুব নিচু টেবিল। মাটিতে বসে তার ওপর ধর্মগ্রন্থ রেখে লামারা প্রত্যহ পাঠ করেন। গুম্ফার ভেতরে বাইরে বিশাল বিশাল বৌদ্ধচক্র ও পতাকা। কাঠের ঐ বৌদ্ধচক্রগুলো একবার ঘোরাতে গেলেও বেশ জোর লাগে। লেহ্ শহরের সর্বত্র রাস্তাঘাটে বয়স্ক পুরুষ মহিলাকে হাতে করে ছোট ছোট চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে পথ হাঁটতে দেখেছি। গ্রাম শহরের বাড়িগুলোর ওপর বৌদ্ধ পতাকা উড়তে দেখেছি। বৌদ্ধধর্মে এই পতাকা এবং চক্র দুটিই খুব পবিত্র।

আমাদের অজ্ঞানতার জন্যই বৌদ্ধধর্মের ঐ সব অদ্ভুতদর্শন ছবির মর্ম উদ্ধার করা যায়নি। হেমিস গুম্ফাতেই সব থেকে বেশি দর্শনার্থীদের ভিড় হয়। ঐ পাথরের চাতালে শীতের সময় অনুষ্ঠিত হয় লামাদের এক বিরাট উৎসব। চাতাল তখন ঢাকা থাকে সাদা বরফে। জীবজন্তুর নানান মুখোশ পরে লামারা সেই চাতালে নাচেন। দূর দূর থেকে আসা লাদাখী মানুষের ভিড়ে চাতাল ভেঙে পড়ে। লাদাখে সাধারণত শীতের সময়ই নানান উৎসব হয়। তার কারণ বোধহয় রাস্তাঘাট সে সময় বন্ধ থাকে। প্রায় কর্মহীন জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যই তারা এ সময় উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

আমরা যখন লাদাখে ছিলাম সে সময় হেমিসে কোন প্রধান লামা ছিলেন না। পদোন্নতির দ্বারা কেউ প্রধান লামা হতে পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস, পুনর্জন্মের দ্বারাই প্রধান লামা নির্দিষ্ট হয়ে থাকেন। অর্থাৎ আগের জন্মে যিনি প্রধান লামা ছিলেন, নতুন করে জন্মলাভের পর তিনিই একমাত্র ঐ প্রধান লামার পদে অভিষিক্ত হতে পারেন। চিরন্তন এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই হেমিসের লামারা বহু খুঁজে তেমন একজনকে বার করেছিলেন যিনি আসলে তিব্বতের অধিবাসী একটি বাচ্চা ছেলে। এক্ষেত্রে মনে আমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে লামারা যাঁকে প্রধান

লামা হিসেবে খুঁজে বার করলেন, কী করে জানা যাবে তিনি আগের জন্মেও প্রধান লামা ছিলেন! কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ মিলিয়েই এই প্রধান লামা নির্বাচনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। হেমিসের অন্যান্য লামারা ঐ বাচ্চাটিকে এনে প্রধান লামার আসনে বসিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর বয়স বছর পনেরো ষোলো হলে তাঁকে আবার তিব্বতে পাঠানো হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পড়াশুনোর জন্য। কারণ তখন সাধারণ লামারাও তিব্বতে যেতেন ধর্ম-সংক্রান্ত পড়াশুনোর জন্য। কিন্তু চীন তিব্বত অধিগ্রহণ করে নেওয়ার পর হেমিসের সেই প্রধান লামার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফিরে তো তিনি আসেননি। বেঁচে আছেন কিনা তার সঠিক কোন খবর পাওয়া যায়নি। তাই নতুন করে আর প্রধান লামার খোঁজ করতে পারেননি হেমিসের লামারা। এবং সে পদ আজও শূন্য আছে তাই।

ঠিক্‌সে মনেস্টারির বাড়িগুলো যেন পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো। এমন সুন্দর অবস্থানে এই মনেস্টারিটি দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর চোখে পড়ে। উত্তর পশ্চিম দিকে দেখা যায় স্পিতুক মনেস্টারি। দক্ষিণ পূর্বে তাকালে চোখে পড়বে হেমিস গুম্ফা। ঠিক্‌সের সব থেকে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হল তার উপাসনাকক্ষটি। ঘরের প্রতিটি দেওয়ালচিত্রই উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত। ঘরের মধ্যে বুদ্ধের এক বিশাল মূর্তি আছে, যেটা তৈরি হয়েছে গত শতাব্দীর শেষের দিকে। দেওয়ালে অবলোকিতেশ্বর, মহাকাল, ধর্মরাজের রঙিন ছবি। দেওয়ালে ঝোলানো আছে বড় বড় মাপের টঙ্কা বা স্ক্রোল। এই ঠিক্‌সে মনেস্টারিটি অপেক্ষাকৃত নবীন। দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোও সেদিক থেকে আধুনিক মনে হয়। দেওয়ালে দেওয়ালে লামাদেরও অসংখ্য মুর্তি দেখলাম। হেমিসের মতই এই ঠিক্‌সেতেও উৎসব হয়। মুখোশ পরে লামারা নাচে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময়ই ঠিক্‌সে মনেস্টারি কিছুটা প্রাণ পায়।

ফতুলা পাস। লেহ্ যাওয়ার পথে এই পাস্ই সব থেকে উচ্চতর, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এইখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রাস্তা নেমে গেছে ইন্ডাসের কোলের কাছে। পাহাড়গুলির গায়ে যেন সূর্যের সপ্তাশ্বিবাহিত রথ নেমে এসে ছড়িয়ে দেয় তার সাতটি রঙের রামধনুকে। চারপাশের পাহাড়ের নানান আকৃতি তাদের আশ্চর্য বৈচিত্র্যে আমাদের স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অন্তত লেহ্‌শ্রীনগর সড়কের ঐ কয়েক কিলোমিটার অংশ। এখন থেকেই প্রধান সড়ক ছেড়ে ছোট্ট একটি একাকী নির্জন পথ প্রায় নিঃশব্দ পাহাড়পুরের বুক চিরে নেমে গেছে লামায়ারু মনেস্টারির দিকে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত লেহ্ যাওয়ার পথের মানুষকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও থামতে হত লামায়ারুর আঙিনায় এসে। চারপাশের রুক্ষ পাহাড আর ঐ মনেস্টারির আকর্ষণ উপেক্ষা করা যেত না কিছুতেই। কিন্তু আজকাল ঐ নতুন প্রধান সড়ক দিয়ে যাত্রীবোঝাই বাস আর লামায়ারুর উপর দিয়ে যায় না। তাকে এক পাশে রেখে পাহাড়ের নিথর স্তব্ধ ঢেউ ঠেলে ঠেলে আবার উঠে যায় লেহ্‌র দিকে।

বৌদ্ধ ধর্মের ব্রী-গুঙ্গ-পা শাখার অন্তর্ভুক্ত এই লামায়ারু মনেস্টারি। দুই ভারতীয় তান্ত্রিক তিল্লোপা এবং তাঁর শিষ্য নরোপাকে ঐ ব্রী-গুঙ্গ-পা শাখার জনক হিসেবে মনে করা হয়। নরোপার শিষ্যরা তাঁর ধর্মীয় উপাখ্যানগুলি তিব্বতে প্রচার করেন। গড়ে ওঠে ব্রী-গুঙ্গ মনেস্টারি। আর এই মনেস্টারির নাম অনুসারেই বৌদ্ধ ধর্মের-শাখাটি ব্রী-গুঙ্গ-পা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

তিব্বতের রজেনৈতিক জীবনে এক সময়ে ঐ ব্রী-গুঙ্গ-পা মনেস্টারির প্রভাব ছিল অপরিসীম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তার প্রভাব তিব্বতের সীমানা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী লাদাখেও বিস্তার লাভ করে। অনুমান করা হয় যে, ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে লামায়ারু ব্রী-গুঙ্গের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে তারই পথের অনুগামী হয়।

মনেস্টারির ভিতরের কয়েকটি মূর্তি দেখে অনুমান করা হয় যে লামায়ারু রিন-চেন-জাং-পোর সমসামায়িক। সিংহাসনে আসীন ভৈরোকনার মূর্তিটিই এই গুম্ফার প্রধান দ্রষ্টব্য। ভৈরোকনার চারপাশে ঘিরে আছে ভারতীয় পুরাণের অতি পরিচিত গরুড় ও মকরদ্বয়। ঐ একই ঘরে চার অবতার রূপে বুদ্ধের চারটি মূর্তি আছে। ঘরের বাঁদিকের দেওয়াল জুড়ে এগারো মাথার বিশাল অবলোকিতেশ্বরের (শিব) ছবি। ডানদিকের দেওয়ালে আরো অজস্র দেবদেবীর ছবি, বুদ্ধের জীবন সংক্রান্ত নানা ছবি আঁকা মনেস্টারির দেওয়াল জুড়ে। মনেস্টারির বহু চিত্র আজ ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেলেও এখনও কিছু দেওয়ালচিত্র অবিকৃত থেকে গেছে।

লাদাখে দেখা যায় বেশির ভাগ মনেস্টারিগুলো হয় ইন্ডাসের কাছাকাছি, কিংবা মনেস্টারি থেকে দূরে তাকালে দেখা যায় ইন্ডাসের সুনীল জলরাশি। কখনো স্পষ্টভাবে ইন্ডাসকে দেখা না গেলেও দূর থেকে যেন তার আভাস মেলে। মোট কথা অনায়াসে বলা যায়, ইনডাস যেন কখনও বৌদ্ধ গুম্ফাগুলোর সঙ্গ ছাড়েনি। আলচী মনেস্টারির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। লেহ্ যাওয়ার পথেই একটি ছোট গ্রাম পড়ে, সাস্পল। সাস্পলকে ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলে সামনে পড়ে একটি ব্রিজ। এই ব্রিজ থেকে একটি রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূর দিগন্তে। পথে আরো একটি গ্রাম ছাড়িয়ে দুপাশে কিছু গাছ-পালা খেত-খামার আর কাছে-দূরের পাহাড়ের সঙ্গী হয়ে চলে যাওয়া যায় একদম ইন্ডাসের তীরে। আর এই ইন্ডাসের তীর থেকে যেন খাড়া উঠে গেছে আলচী মনেস্টারি। মনেস্টারিটিএকটু লম্বাটে ধরনের। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রায় একশ মিটার লম্বা মনেস্টারিটি চারপাশ অনুচ্চ দেওয়ালে ঘেরা। অন্যান্য মনেস্টারির মত আল্চীরও উপসনাকক্ষ এবং অন্যান্য কক্ষগুলি অসাধারণ দেওয়ালচিত্রে সমৃদ্ধ। যদিও এই মনেস্টারিটি অত্যন্ত প্রাচীন, তবুও এর দেওয়ালচিত্র এবং তার আশ্চর্য সুন্দর রঙ বিশাল আকৃতির মূর্তি এবং তার কারুকাজ সবই অবিকৃত আছে। পর্যটকদের কাছে তাই

আল্চীর আকর্ষণ খুব বেশি। মনেস্টারির ভেতরে তিনটি চোটেন বা চৈত্য আছে, যার আশ্চর্য সুন্দর দেওয়ালচিত্রগুলি আজও বহু রঙে উজ্জ্বল। আশ্চর্য এই যে, ঐ বড় চোটেনগুলির ভেতর আবার ছোট ছোট চোটেন আছে, যেগুলির দেওয়ালও নানা রঙিন ছবিতে অলঙ্কৃত। বহু দেবদেবীর ছবির সঙ্গে তিব্বতী পণ্ডিত ও স্থপতি সেই রিন-চেন-জাং-পোর ছবিও অবস্থান করছে।

যে কোন মনেস্টারিতে উপাসনা কক্ষটিই প্রধান এবং এটিই প্রথম তৈরি হয়। যতদূর জানা যায় আল্চী মনেস্টারির ঐ উপাসনাকক্ষটি তৈরি করেছিলেন কাল-ইদান-শেষ-রাব নামক এক ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে তেমন কিছু না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা যায় যে, তিনি নিয়ার-মা মনেস্টারিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। লেহ্‌র ওপাশে ইন্ডাস উপত্যকা থেকে কুড়ি কিলোমিটার উঁচুতে ঐ নিয়ার-মা মনেস্টারিটি এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এবং সেই বিখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিত তৈরি করেছিলেন ঐ নিয়ার-মা মনেস্টারিটি। সুতরাং মনে করা যেতে পারে এই আল্চীও নিয়ার -মার মোটামুটি সমসাময়িক। এবং এটি তৈরি হয়েছিল সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাছাড়া মনেস্টারির স্থাপত্য বা দেওয়ালচিত্রগুলো রিন-চেন-জাং-পোর সমসময়কেই যেন নির্দেশ করে। অর্থাৎ এটি অন্য সময়ে তৈরি বা পরে এর বিশেষ কোন রদবদল করা হয়েছে এমন মনে করার যেন কোন অবকাশই নেই। মোটামুটি সব মনেস্টারিতেই দেখেছি বিশেষ করে উপাসনাকক্ষটি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আল্চীতেও তাই। কক্ষটির একদম ছাদের কাছাকাছি দু একটি জানালা দিয়ে অল্প আলো নেমে আসে তির্যকভাবে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়লে কিছুটা ভৌতিক রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন হতে হয়। বোঝা যায় চারপাশে অনেক কিছু আছে। কিন্তু কী আছে সেটা এক লহমায় যেন দৃষ্টিগোচর হয় না। তারপর অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে সিংহাসনাসীন ভৈরোকনার বিশালাকৃতি মূর্তি। সিংহাসনের চারপাশ

মকর ও গন্ধর্বের নানা মূর্তিতে অলঙ্কৃত। ভৈরোকনার পাশে বুদ্ধের চার অবতারের বড় বড় মূর্তি। ডান দিকের একটি মূর্তির পাশে এক লামার মূর্তিও একত্র বিরাজমান। অনুমান করা হয় ঐ লামার মূর্তিটি অতীশ দীপঙ্করের। অন্যান্য মনেস্টারির তুলনায় আল্‌চীর লামাদের সঙ্গে কিছু ভাব বিনিময় করা যায়।

প্রাচীন মনেস্টারিগুলি সবই প্রায় রিন-চেন-জাং-পোর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। এই রিন-চেন-জাং-পোর স্থাপত্য রীতির প্রধান বৈশিষ্টই হলো উপসনাকক্ষের প্রধান মূর্তিটিই ভৈরোকনা বুদ্ধের। প্রাচীন মনেস্টারিগুলিতে এই ধরনের গঠন রীতি লক্ষ্য করা যায়। আল্‌চীর বেশির ভাগ মূর্তি বা ছবিগুলোই হল ভৈরোকনা, শাক্য মুনি, মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতাকে নিয়ে। একই বুদ্ধের নানান অবতার কল্পনায় এই সব ছবি বা মূর্তি।

কাঠের স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সাম-সেক কক্ষটি, যার সামনের দিকের বেশ কিছু অংশ জীর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু কাঠের স্তম্ভগুলির কারুকাজ সত্যিই দেখবার মত। স্তম্ভগুলির ওপরের দিকে খোদাই করা আছে কতকগুলো সিংহের মুখ। আর দুপাশে ত্রিকোণ কাঠের ফ্রেমের মধ্যে খোদাই করা আছে বুদ্ধের মূর্তি। এই ধরনের কাঠের ফ্রেম এবং তার ভেতর খোদাই করা মূর্তির ব্যবহার কাশ্মীরে কিছু ধ্বংস-প্রাপ্ত বৌদ্ধ এবং হিন্দু মন্দিরের গায়ে লক্ষ করা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে হিমাচলপ্রদেশের কাংরা থেকে নেপাল পর্যন্ত দারুশিল্পের নানান স্থাপত্যে ঐ ধরনের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে পশ্চিম হিমালয়ে স্থাপত্যকলার এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। লক্ষ করেছি আল্‌চী মনেস্টারিতে মঞ্জুশ্রী, মৈত্রেয়, অবলোকিতেশ্বর এই তিনটি মূর্তিরই চারটি করে হাত। লাদাখের গুম্ফা বা মনেস্টারিগুলি ঘুরে দেখার সময় মনে হচ্ছিল এক সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের গভীর সংমিশ্রন ঘটেছিল। যার ফলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই তান্ত্রিক মহাযান হিসেবে আর একটি শাখা তৈরি হয়েছিল। তাই তান্ত্রিক দেবদেবীরাও

বৌদ্ধধর্মে তাদের আসন তৈরি করে নিয়েছিল। হিন্দুধর্মের দেবদেবীদের মতই বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীদের হাত পা বা মাথার সংখ্যাধিক্যও ঘটেছে। কখনও দেখা গেছে অবলোকিতেশ্বরের একটি মাথা। কখনও আবার তার এগারোটি মাথাও দেখা গেছে। ভাবতে অবাক লাগে কত শতাব্দী ধরে কত মানুষ লাদাখের এই দুর্গম পাহাড়ী পথ খুঁজে খুঁজে এক সময়ে পৌঁছেছিল এই সব বৌদ্ধগুম্ফায় কখনও ধর্মান্বেষণে ধর্মচর্চার জন্য, কখনও আবার লামারাই এইখান থেকে বৌদ্ধধর্ম বয়ে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দেশে দেশে। পৃথিবীর নানা দেশে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যখন বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের এক দারুণ প্রতিযোগিতা চলেছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দেশ আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন এই পৃথিবীরই মানচিত্রে চরাচরজুড়ে শীতলতম পাহাড়ের রাজ্যে আজও আট'শ ন'শ বছরের প্রাচীন মনেস্টারিগুলো দাঁড়িয়ে আছে, নীল আকাশের দিকে মুখ তুলে মৌন গাম্ভীর্যে। মনেস্টারিগুলোর ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সত্যি ভুলে যেতে হয়, সময় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

পণ্ডিতদের মতে দশম একাদশ শতাব্দীর আগে লাদাখে কয়েকটি পাথরের খোদাইকাজ ছাড়া এমন কিছু ছিল না যার থেকে তাদের নিজস্ব শিল্প রীতির বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে লাদাখে বহিরাগত বেশ কিছু শিল্পরীতি এসে মিশেছিল কিন্তু কোনটা কোন সময়ের সেটা সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবে দশম একাদশ শতাব্দীতেই লাদাখে বহিরাগত সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্যে তিব্বতী প্রভাবকে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। বাইরের নানান প্রভাব এসে পৌঁছলেও লাদাখীরা সেই শিল্পসংস্কৃতিকে নিজস্ব ঢঙে বা রীতিনীতিতে প্রকাশ করত। তিব্বতীরা প্রথম এসে পাহাড়গুলির শীর্ষে দুর্গ তৈরি করেছিল। সেই দুর্গের কিছু নিচে কখনও বা উপত্যকার কাছাকাছি তারা তৈরি করেছিল বৌদ্ধ গুম্ফা বা মনেস্টারি। আল্‌চী ছাড়া সেই

সময়ের অন্যান্য গুম্ফাগুলি বাসগো নিয়ার-মা ইত্যাদি সবই প্রায় ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে।

তিব্বতী পণ্ডিত অনুবাদক ও স্থপতি রিন-চেন-জাং-পো (৯৫৮-১০৫৫) গু-গে রাজ্যের ধার্মিক রাজা ইয়ে-শেষ-অড্-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বা অর্থ-সাহায্যে লাদাখে বেশ কয়েকটি গুম্ফা তৈরি করেছিলেন। এই নিয়ার-মাই সব থেকে প্রাচীন। এটি তৈরি হয়েছিল এক হাজার খ্রীস্টাব্দে। পাথর এবং মাটির ইট দিয়ে গুম্ফার বাড়িগুলি যে পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিল এবং যে ধরনের দারুশিল্প, দেওয়ালচিত্র এবং নানান মূর্তি দ্বারা গুম্ফাগুলি অলঙ্কৃত, এক কথায় তার পুরোপুরি নির্মাণকৌশল ছিল তিব্বতী শিল্পরীতির প্রভাবপুষ্ট। যদিও ৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতের রাজধানী লাসাতেই বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পশ্চিম তিব্বত এবং লাদাখের রাজারা বহু চেষ্টা করে লাদাখে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এবং সমগ্র লাদাখে তার সুদূর সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

তিব্বতী পণ্ডিত রিন-চেন তিনবার ভারতভ্রমণে এসেছিলেন এবং সতেরো বছর এদেশে কাটিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত নানা পুঁথি-পত্র অর্থাৎ বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেছিলেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যে সব বৌদ্ধগুম্ফা এবং স্কুল ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন, সেগুলির সাহায্যে বৌদ্ধধর্মের নানা উন্নতিসাধন হয়েছিল। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, বৌদ্ধধর্মে নানা অবতার কল্পনার ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। লাদাখের মনেস্টারি-গুলির শিল্পকর্মই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রিন-চেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে যে সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন তা তাঁর স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল।

শিল্পের তুলনায় সাহিত্য, বিশেষ করে ধর্মীয় সাহিত্য বেশ গোঁড়া, অর্থাৎ নিজস্ব গণ্ডির বাইরে সে যেন পারতপক্ষে হাত পা মেলতে চায় না। গ্রহণক্ষমতা বা নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার প্রায় সীমাবদ্ধ।

কিন্তু শিল্পের জঙ্গমতা যেমন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত খুব অনায়াস হতে পারে। তেমনি তার গ্রহণক্ষমতা অর্থাৎ বাইরে কোন কিছুকে নিজস্ব ঘরানায় আত্মসাৎ করে নিতে পারে খুব সহজে। তাই বিভিন্ন সময়ে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে নানান দেশের শৈল্পিক রীতিনীতির অবাধ সংমিশ্রণ ঘটেছে। দেখা গেছে এক দেশের প্রধান দেবদেবীর পাশে অন্য দেশের লৌকিক দেবদেবীরাও একত্র সহাবস্থান করেছে। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই নানান দেশে বাণিজ্য পথের মধ্যে দিয়েই দেশ দেশান্তরের নানা জাতির শিল্প-সংস্কৃতি-ধর্ম, একত্র মিলিত হয়েছে। লাদাখে শুধু তিব্বতী নয় কাশ্মীরী, মধ্যএশিয়ান, পার্শিয়ান, মুঘল, নেপালী, চৈনিক শিল্পরীতির প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। কখনও তা এসেছে রাজছত্রের ছায়ায় ছায়ায় কখনও এসেছে ধর্মের হাত ধরে।

প্রাচীন গুহাচিত্র বা মন্দির, প্রাসাদের স্থাপত্যশিল্প রক্ষণাবেক্ষণের ঔচিত্য সম্পর্কে আমরা সবাই যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু সে কাজে সরকারী প্রচেষ্টাকে যখন নড়েচড়ে বসতে দেখা যায়, তখন তা ধ্বংসের এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে তাকে সংরক্ষণ করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। লাদাখের মনেস্টারিগুলোর অবস্থাও ক্রমশ করুণ হয়ে উঠছে। অসাধারণ সুন্দর দেওয়ালচিত্রগুলি বছরের পর বছর ক্রমাগত ধূপ ও ধোঁয়ায় তাদের রঙিন ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঠিক মত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন খোদাইকাজও নষ্ট হয়ে যাছে। তবে অনেক জায়গায় উজ্জ্বল নীল, লাল, হলুদ, সবুজ রঙ ছবিগুলোকে আজও ভীষণ জীবন্ত করে রেখেছে। কিন্তু তাদের ধীর অবক্ষয়-রোধের জন্য সরকারী পক্ষ থেকে যদি এর উপযুক্ত ব্যবস্থা না করা হয় তবে একদিন তারা চিরকালের জন্য কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে।

আগেই বলেছি, লাদাখকে ল্যাণ্ড অফ মনেস্টারিস বলা হয়। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটা না একটা ছোট বড় মনেস্টারি থাকে। ছোট মনেস্টারিগুলোতে দু তিন জন মঙ্ক (বৌদ্ধভিক্ষু বা সন্ন্যাসী) থাকেন।

বড় বড় মনেস্টারিগুলোতে অনেক সময় এক'শর বেশি মঙ্ক বসবাস করেন। ১৯৭১এর আনুমানিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে যে, সমস্ত লাদাখে পনেরো থেকে সতেরো হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং প্রায় এক'শর মত ভিক্ষুণী থাকেন।

লাদাখে গিয়ে, বিশেষ করে তার মনেস্টারি বা গুম্ফাগুলো দেখলে মনে হয় যেন এই মনেস্টারিগুলোকে কেন্দ্র করেই লাদাখের জীবন আবর্তিত হয়। লেহ্‌র সিংহাসনে যে সবসময় বৌদ্ধ রাজারাই বসেছেন তা নয়। মুসলমান রাজারাও রাজত্ব করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মই লাদাখের জাতীয় ধর্ম হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। এবং লাদাখীদের জীবনে বৌদ্ধধর্ম এক দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আর এই ধর্মচর্চার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ঐ মনেস্টারিগুলো। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও এই আধুনিক যুগে লাদাখীদের সামাজিক জীবনের ওপর মনেস্টারিগুলোর প্রভাব একদম বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই মনেস্টারিগুলো লাদাখে বিভিন্ন ধরনের মানুষের একই সঙ্গে নানা প্রয়োজন বা তৃষ্ণা মিটিয়েছে। যেমন—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য এগুলি ধ্যান ও উপাসনার আদর্শ স্থান। আবার পর্যটকদের কাছে এই মনেস্টারিগুলোর চিত্রকলা বা স্থাপত্যকলার আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর যারা নিসর্গ প্রেমিক, তাদের কাছে পাহাড় ও ইন্‌ডাস উপত্যকার পটভূমিতে মানুষের ঐ আশ্চর্য সুন্দর শিল্পকর্ম, যার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একমাত্র প্রকৃতিকেই যেন স্বীকার করে নেওয়া যায়, তার আকর্ষণও অবর্ণনীয়।

লামায়ারু মনেস্টারিতেই কুড়ি তিরিশজন বৌদ্ধভিক্ষু স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই ভিক্ষুরা ধ্যান, উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ এবং নানা পুঁথি পাঠের মধ্যেই নিত্য নিমগ্ন থাকেন। যদিও মনেস্টারিগুলোর নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে কিছু জমিজমা থাকে, তবু ঐ মনেস্টারি এবং ভিক্ষুদের অস্তিত্ব টিকে থাকে ভক্তদের অনুদানের ওপর। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগ দেন না এবং কোন ধর্মীয় পুঁথিও তাঁদের

পড়তে হয় না। তবে ভিক্ষুণীদের ওপর দৈবিক 'ভর' হয় বলে লাদাখীরা মনে করে।

লাদাখীদের সামাজিক জীবনে এই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও আরো নানা ভূমিকা পালন করে থাকেন। যেমন—তাঁরা সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে থাকেন। সেচ ব্যবস্থার ওপরও তাঁদের যথেষ্ট মনোযোগ থাকে। আর তাঁদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল চিকিৎসক হিসেবে। লাদাখীরা তাঁদের সনাতন চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপরই আজও বেশি নির্ভরশীল। এবং সেই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিকে তাঁরাই টিকিয়ে রেখেছেন। লাদাখের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজনের মনেস্টারিতে গিয়ে বাস করার রীতিটি অতি সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত চালু ছিল।

লাদাখের ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন বৌদ্ধধর্মের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে ঐ ধরনের পরিবেশে একমাত্র এই ধর্মই টিকে থাকতে পারে। ভাবতে গেলে খুবই আশ্চর্য হতে হয় যে লাদাখের ঐ নির্মম প্রকৃতির ভয়ঙ্কর পাহাড়ী আঁকেবাঁকে লাদাখের জীবন কী করে এত শান্ত! মনে হয় যেন লাদাখীদের ঐ শান্ত সরল জীবনযাপন যেন একমাত্র প্রকৃতি দ্বারাই নির্ধারিত। এবং হাজার চেষ্টা করলেও লাদাখীরা এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃতির এক বিরাট অনিশ্চয়তা এবং ভয়ঙ্করতা যেন সদাসর্বদাই লাদাখীদের মাথার ওপর খাঁড়ার মতই ঝুলে থাকে। এই সীমাহীন প্রতিকূলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্যই লাদাখের প্রতিটি মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তাই বোধহয় লাদাখে ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদ মহীরূহ হয়ে তাদের সামাজিক জীবনে বিশাল কোন ফাটল সৃষ্টি করতে পারে না। সহস্র বছরের ঘুম ভাঙিয়ে বীজ তাই কোনদিন বরফের শক্ত দেওয়াল ফাটিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। এমনও দেখা গেছে বহুযুগ আগে মানুষেরই সৃষ্ট কোন কাজ হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সে ধ্বংসাবশেষ প্রকৃতির

সঙ্গে মিলেমিশে এমনই এক পরিণতিতে পৌঁছে গেছে, যে অনায়াসে সে প্রকৃতিরই আর এক অনন্য সুন্দর স্থাপত্য হিসেবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। যেমন লেহ্ শহরের কাছাকাছি 'শে' মনেস্টারি দেখে কখনও মনে হয় না তা মানুষের হাতে তৈরি কোন স্থাপত্য। প্রকৃতি যেন খেয়ালখুশি মত নিজস্ব কারিগরিতে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে ঐ অদ্ভুত শিল্পকর্ম।

উপাসনাই হল মনেস্টারি-জীবনের প্রধান অঙ্গ। উপাসনায় বসার ব্যাপারেও নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। যিনি উপাসনা পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় গেলঙ্। যে কোন মনেস্টারিতে উপাসনাকক্ষটিই হল প্রধান কক্ষ। উপাসনার সময় গেলঙ্ বসেন সকলের সামনে। তাঁর কাছাকাছি যে হলুদ পরিচ্ছদ পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরা বসেন ইতিমধ্যেই তাঁদের বেশ কয়েকটি ধর্মীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। উপাসনাকক্ষের প্রায় প্রবেশ দ্বারের কাছাকাছি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আরো কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসেন এবং সবার শেষে যাঁরা বসার সুযোগ পান তাঁরা হলেন শিক্ষানবিশ। এই মনেস্টারিগুলোতে খুব অল্পবয়েসী শিক্ষানবিশদেরও দেখা যায়। একজন শিক্ষানবিশকে গেলঙ্-এর পদমর্যাদায় উঠতে গেলে অন্তত কুড়ি বছর সময় লাগে। এবং এই কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে নানা জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের দু'শো তিপ্পান্নটি নিয়ম শিখতে হয়। পাশ করতে হয় তর্কবিদ্যার বেশ কয়েকটি কঠিন পরীক্ষায়। গেলঙের উপাসনা পরিচালনা করার ঢঙ্‌টি অনেকটা সঙ্গীত পরিচালকের মতই। অর্থাৎ একজন সঙ্গীত পরিচালক যেভাবে একটি অর্কেস্টাকে পরিচালনা করেন, অনেকটা সেভাবেই হাতের নানা ভঙ্গিমার সাহায্যে গেলঙ্ পুরো উপাসনাটি পরিচালনা করেন। বাদ্যযন্ত্রীদেরও দৃষ্টি সজাগ থাকে গেলঙের ওপর। গেলঙের হাতের নির্দেশে কখনও তারা gong (অনেকটা বড় আকৃতির কাঁসরের মত দেখতে), কখনও শিঙার মত বাঁশি বাজায়। ভগবান বুদ্ধের উপাসনার জন্যই ঐ 'গঙ্' বাজানো হয়। আর শিঙা বাজানো

হয় সাধারণত আত্মা-প্রেতাত্মাদের জাগিয়ে তোলার জন্য। মানুষের মাথার দুটো খুলি দিয়ে তৈরি 'ডব্‌ল গঙ্‌' বাজানো হয় সাধারণত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিরতিকে নির্দেশ করার জন্য।

লাদাখে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা আগের তুলনায় কমে এলেও পথে ঘাটে এখনও অনেককে দেখা যায় গণ্ডি কাটতে কাটতে চলেছেন। কেউ বা হাতে ধর্মচক্র ঘোরাতে ঘোরাতে মন্ত্র পড়তে পড়তে চলেছেন। গণ্ডি কাটতে কাটতে অনেকে পথের পাশে একটু জিরিয়ে নেন। স্থানীয় লোকেরা তখন তাঁদের ছাঙ খাওয়ায় কিছু পুণ্যার্জনের আশায়।

লাদাখের প্রতিটি গ্রামেই প্রায় একজন করে গল্প-বলিয়ে থাকে, যারা কিনা ঘরে তৈরি এক ধরনের তারের যন্ত্র বাজিয়ে তাদের গল্প শোনায়। সমস্ত লাদাখ জুড়ে আজও অসংখ্য রূপকথা ছড়িয়ে আছে। আত্মা, প্রেতাত্মায় লাদাখীরা খুবই বিশ্বাসী। অন্যান্য দেশের মানুষের মতই লাদাখীদের প্রচুর কুসংস্কার আছে। এবং সেই সব কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে নানা আচার অনুষ্ঠান তারা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। যেমন, যে মেয়ে প্রথম মা হতে চলেছে তার চলাফেরার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সে সময় তাকে মাঠের কাজে যেতে দেওয়া হয় না। রান্নাঘরেও প্রায় তার ঢোকা নিষেধ। এমন কি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওপরও কিছু বিধিনিষেধ থাকে।

লাদাখীদের বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারটাও অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ। ছেলে বিবাহযোগ্য হলে বাবার মাথায় প্রায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কারণ সব কিছু মিলিয়ে বহু খুঁজেপেতে বাবাকে ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে হয়। বিয়ের দিনক্ষণ অন্তত এক বছর আগে ঠিক করতে হয়। একজন ভবিষ্যৎবক্তাই এই দিনটি ঠিক করেন। আমাদের দেশের মত লাদাখেও পণপ্রথার রীতি চালু আছে। তবে ব্যবস্থাটা ঠিক উল্টো। অর্থাৎ পাত্রপক্ষকেই পণ দিতে হয়। তবে পণে অবশ্য টাকা পয়সার ব্যাপার থাকে না। পণ হিসেবে দিতে হয় এপ্রিকট, চা, তিব্বতী মদ, স্কার্ফ, মাংস, মাখন, চাল ইত্যাদি। পাত্রের কাকাকে

দিতে হয় একটি বড় কেক, যেটিকে ঘিরে আত্মীয় পরিজনরা নাচগান করে। বিয়ের নির্ধারিত দিনের আগে দুপক্ষেই নানা কথাবার্তা এবং তাকে ঘিরে কিছু উৎসব অনুষ্ঠান হয়। এই ধরনের প্রাক্ বিবাহ অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়া এবং পানীয়ের বন্যা বয়ে যায়। ভোজন তালিকাতে পানীয় সব থেকে বেশি প্রাধান্য পায়। পানীয় হিসেবে চা এবং নাঙ্-ছাঙ্ই প্রধান। এই নাঙ্-ছাঙ্ খুবই কড়া ধরনের মদ। কিন্তু আমন্ত্রিত সকলকেই এই মদ পুরো মাত্রায় পান করতে হয়। পানীয়ের মাঝে মাঝে খাওয়া হয় শুকনো দই, মাংসের নানা পদ। এইসব খাওয়ার পর আসে সল-ছাঙ্ (আর এক ধরনের মদ)। সবশেষে খাওয়া হয় ভাত।

লাদাখীদের বিবাহঅনুষ্ঠানে নাচ গানেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। পাত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দশ বারোজন যুবক সিল্কের পোশাক ও লম্বা টুপি মাথায় দিয়ে খুব ভোরবেলা রওনা হয়, মেয়ের বাড়িতে গিয়ে তারা নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া করে। শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে যাওয়ার আগে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মেয়েকে উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ করেন। সূর্য অস্ত গেলে রাতের অন্ধকারে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পৌঁছায়। কোন কারণে পাত্রী যদি দিনের বেলাতেই পাত্রপক্ষের বাড়ি পৌঁছে যায় তবে পাত্রপক্ষকে কোন মনেস্টারিতে গিয়ে তার জন্য জরিমানা দিতে হয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছনোর পর আবার একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এসে যাচাই করে দেখেন মেয়ের ওপর কোন খারাপ আত্মা 'ভর' করে আছে কিনা। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছনোর পর একাধিক দিন ধরে উৎসব চলতে থাকে। আত্মীয়স্বজন নাচ গান খাওয়া দাওয়ায় সেই উৎসবে মেতে থাকেন।

লাদাখ দরিদ্র দেশ হলেও লাদাখী ছেলেমেয়েরা সোনা রুপো এবং মূল্যবান সব পাথরের অলঙ্কার পরে থাকে। আমরা লেহ্ শহরের দোকানে দোকানে অজস্র মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার দেখেছি। আমাদের সে অলঙ্কার কেনার সাহস না হলেও এটা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়,

ঐসব অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি লাদাখীদের মধ্যে চালু আছে। লেহ্‌র প্রায় সমস্ত দোকানে, হোটেলে, রেস্তরাঁয় এবং প্রতিটি মনেস্টারিতে অসংখ্য সিল্কের স্ক্রোল দেখেছি। স্থানীয় ভাষায় যেগুলিকে বলে টঙ্কা। এই টঙ্কাগুলি রূপসজ্জাতেই যে শুধু অসাধারণ তাই নয়, সে সঙ্গে মূল্যবানও বটে। টঙ্কাগুলিতে উজ্জ্বল রঙে নানা জীবজন্তু, ড্রাগন ইত্যাদির ছবি আঁকা থাকে। আবার বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনীও রঙরূপে ঐ টঙ্কাগুলোকে অলঙ্কৃত করে। এই টঙ্কাগুলি এক একটা বিশালাকৃতির হয়। হেমিস গুম্ফায় এর নমুনা দেখেছি। শুনেছি হেমিসে বেশ কয়েক মিটার লম্বা এমন একটি টঙ্কা আছে যেটি এগারো বছর অন্তর হেমিসের এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রচণ্ড শীতে লাদাখের রাস্তাঘাট যখন বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তখন লাদাখীদের কর্মহীন জীবন মেতে ওঠে উৎসব আনন্দে। শীতকালে হেমিস ছাড়া প্রতিটি মনেস্টারিতে নানা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়। লাদাখীরা তাদের নববর্ষ উদ্‌যাপন করে তিব্বতী একাদশ চান্দ্রমাসের প্রথম দিনে। লেহ্‌র সব থেকে বড় উৎসবটি তিব্বতী দ্বাদশ চান্দ্রমাসের শেষের দিকে হয়। বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি লাদাখীরা সাধারণত এই সময়েই পালন করে থাকে।

হেমিসের বাৎসরিক উৎসবটি সাধারণত জুন জুলাই মাসের কোন একটি সময় অনুষ্ঠানটি হয়। হেমিসের এই উৎসবটি এমন সময় হয় যখন লাদাখীদের সঙ্গে বিদেশী পর্যটকরাও এই উৎসবে যোগ দিতে পারে। তখন রাস্তাঘাট তুষারমুক্ত হয়ে যায়। বার্চ. পপলার গাছে কচি কচি সবুজ পাতারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নীল আকাশের নীচে ইনডাসের জমে যাওয়া শরীর গলে গিয়ে আবার সুনীল জলরাশি হয়ে টগবগিয়ে ছুটে চলে উঁচু নিচু উপলখণ্ডে শব্দ তুলে তুলে। দেশের নানা জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটে হেমিসের আঙিনায় এসে পৌঁছয়। হেমিসের এই উৎসবটি ধর্মীয় উৎসবের সীমানা ছাড়িয়ে যেন এক বিশাল

মেলার চেহারা নেয়। নানারকম খাবার, পানীয়, অলঙ্কার, কাঠ সবই বিক্রি হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই পানীয় বিক্রেতার কাছেই বেশি ভিড় হয়। রঙিন তাঁবু খাটিয়ে অনেকে হোটেলও চালু করে দেয় দু তিন দিনের জন্য, বিদেশি পর্যটকদের ক্ষেত্রে যা খুবই সহায়ক হয়।

লাদাখের প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই অনেকে প্রায় বাধ্য হয়েই যাযাবর জীবনযাপন করে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় তারা পাহাড়ের উঁচু থেকে নেমে আসে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে। গ্রীষ্ম এলে তুষার গলতে থাকলে তারা আবার উঠে যায় ওপরে। ঐ সমস্ত যাযাবররা হেমিসের এই উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় বহু জিনিস সংগ্রহ করে নিতে পারে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এই উৎসবে। উপাসনা ইত্যাদি হয়। মাঝে মাঝেই নানা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে গমগমিয়ে ওঠে হেমিস গুম্ফার সমস্ত প্রাঙ্গণ। লামাদের মুখোশনৃত্য দেখার জন্য দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে মনেস্টারির ব্যালকনি, ছাদ ইত্যাদিতে। সেই বিশাল ভিড় সামলানোর জন্য রীতিমত পুলিশী ব্যবস্থাকেও জোরদার করতে হয়। লাদাখে হেমিসের এই বর্ণাঢ্য উৎসবেই সব থেকে বেশি দর্শনার্থীদের সমাগম হয়।

শরৎ এবং শীতের প্রথম দিকে লাদাখে খাবারদাবারের যথেষ্ট প্রাচুর্য থাকে। গম, বার্লি বাইরে থেকে আমদানি হয়। এই সময়ে লাদাখে প্রচুর ছাগল ভেড়ার মাংসও পাওয়া যায়। আলু, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি সব্‌জি লাদাখীরা মাটির তলায় জমিয়ে রাখে শীতের জন্য। তখন চাষবাস তো মোটেই সম্ভব নয়, বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্যও আমদানি করা যায় না। সমস্ত শীতকালে লাদাখীরা ঐ জমিয়ে রাখা খাবারের সদ্ব্যবহার করে। টমেটোও শুকিয়ে রেখে নানাভাবে খায়। নভেম্বর পর্যন্ত লাদাখে কাশ্মীরী আপেল পাওয়া যায়। আর সমস্ত শীতকাল ধরেই স্থানীয় আখরোটে লাদাখের বাজার ছেয়ে থাকে। তবে

কোন সময়েই লাদাখে চা বা ছাঙ্ জাতীয় পানীয়ের অভাব ঘটে না।

কার্পেট বোনা, কাঠ খোদাই, নানান ধাতুর কাজ এগুলো নিয়ে লাদাখীরা কোনদিন নিজস্ব হস্তশিল্প গড়ে তোলেনি। আসলে এতো অল্পায়াসে খুবই উৎকৃষ্ট জিনিস লাদাখের বাজারে এসে পৌঁছেছে নানা বাণিজ্যপথ দিয়ে, যে নিজস্ব চেষ্টায় লাদাখীরা এইসব শিল্পচর্চা আর করেনি। তাই হস্তশিল্পের দিক থেকে লাদাখীরা দীন থেকে গেছে। এই সব কারণে লাদাখে অর্থনৈতিক অবনতিও ঘটেছে। তবে বর্তমানে ভারতীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য এখানে একটি হস্তশিল্পের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। লেহ্ শহরে বিদেশী সাহায্যে একটি কার্পেট তৈরির কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রে মূলত তিব্বতী রিফিউজিরাই কার্পেট বোনার কাজে নিযুক্ত আছে। আমরা লেহ্ শহর দেখতে বেরিয়ে ঐ কেন্দ্রেও একসময়ে পৌঁছেছিলাম। তিব্বতী ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কাজ করে চলেছে। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। কথা, গল্প, হাসির মধ্যেই তাদের হাত চলেছে প্রায় মেশিনের মত। আমরা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিলাম। প্রত্যেকের সামনে কাঠের ফ্রেমে আটকানো কার্পেটে কী অদ্ভুত উজ্জ্বল রঙের নক্সা ফুটে উঠছে তাদের হাতের আশ্চর্য কারিগরিতে।

যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ঐ হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় বুনে চলেছেন আশ্চর্য সুন্দর সব কার্পেট, যা বহু মূল্যে পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ কিনে নিয়ে ঘর সাজায়, মুগ্ধ হয় কার্পেটের রূপসজ্জায়, অলঙ্করণে, তাঁদের অর্থাৎ সেই কুশলী শিল্পীদের চেহারায়, পোশাকে-আসাকে কিন্তু ফুটে থাকে দীনতার ছাপ। বোঝা যায় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তাঁদের বাসস্থান বহুদূরে।

লেহ্‌র বাজারে আসে ভুটান থেকে রুপোর নানান জিনিস এবং সিল্ক। নুডলসের প্যাকেট আসে কালিম্পং থেকে। কারণ লাদাখীরা বাজারে বিক্রির জন্য নুডলস তৈরি করে না। শুধু নিজেদের খাওয়ার

মত তৈরি করে নেয় বাড়িতে। লেহ্‌তে ভারতীয় নানা জিনিসের স্থানীয় ব্যবসাগুলোও পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা কেউ কেউ লাদাখে বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকারও পেয়ে গেছে। লেহ্‌তে কিছু স্থানীয় লোকদের দোকান আছে যারা, সাধারণত লাদাখীদের সেইসব সনাতন পোশাক বিক্রি করে থাকে। তবে লেহ্‌র একটি নিজস্ব ব্যবসা আছে। লেহ্‌ শহর থেকে নানা জায়গায় 'ট্যাক্সি সারভিস' চালু আছে। ট্যাক্সি বললেও জিপই এই সারভিসের মূল বাহন। মূলত পর্যটকদের জন্যই এই ব্যবসা চালু থাকে। কারণ লেহ্‌ থেকে নানা মনেস্টারিতে এই জিপে যাওয়া যায়। এইরকমই একটি জিপে আমরা লাদাখের মনেস্টারিগুলো দেখতে গিয়েছিলাম।

লাদাখ কিছুদিন ধরে বিদেশী পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে, চীন তিব্বত অধিগ্রহণ করে নেওয়ার পর তিব্বতী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ বিদেশীদের অনেক কমে গেছে। কিন্তু লাদাখ এমন একটি দেশ, যেখানে পর্যটকরা অনায়াসে পৌঁছতে পারে এবং তিব্বতী সংস্কৃতির কিছুটা রসাস্বাদনও সেখানে সম্ভব হয়।

লাদাখের অদ্ভুত রুক্ষ সৌন্দর্যের জন্যই বোধ হয় তাকে বলা হয় Broken Moonland। বাস্তবিকই লাদাখের-সৌন্দর্যকে বর্ণনায় মূর্ত করা যায় না। তার সমস্ত সৌন্দর্যের একটু আভাস দেওয়া যায় মাত্র। প্রকৃতি যে এত ভয়ঙ্কর-সুন্দর হতে পারে লাদাখে পৌঁছতে না পারলে তা বোধহয় পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারতাম না। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, লাদাখী জীবন-যাপনেও যেন বহু-প্রাচীন এক গন্ধ লেগে থাকে, যার দুর্নিবার-আকর্ষণ-ক্ষমতা মানুষকে একাধিকবার লাদাখে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এখন পর্যন্ত আমি লাদাখে একবারই পৌঁছতে পেরেছি। কিন্তু ভেবে রেখেছি আমার সমস্ত ইচ্ছেশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্তত আর একবার তার সান্নিধ্যে পৌঁছব।

লাদাখে পর্যটকদের মধ্যে বেশির ভাগই বিদেশী এবং তারা পৃথিবী নানান অঞ্চল থেকে আসে। দুর্গম পাহাড়ী পথে মুহুর্মুহু সব ভয়ঙ্কর বাঁক আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভয়েই সম্ভবত দেশীয় পর্যটকদের সমাগম লেহ্‌তে কম। বেশির ভাগ বাঙালীর দুর্দমনীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত তাই গুলমার্গ বা সোনমার্গ পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। যাঁরা একটু আধটু অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আগ্রহী, সৌন্দর্য-পিপাসু এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধানী, তাঁরা অনায়াসেই একবার লাদাখ এবং তার রাজধানী লেহ্‌তে ঘুরে আসতে পারেন। ঠাণ্ডাটাকে একটু মানিয়ে নিলে পথ তেমন কষ্টকর নয়। আর নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদের মতই তাঁরাও লাদাখীদের অদ্ভুত শান্তিপ্রিয় সরল জীবনযাপন এবং তাদের টগবগে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হাসিখুসি সুন্দর মুখ দেখে মুগ্ধ হবেন, মুগ্ধ হবেন লাদাখের রুক্ষ পাহাড়ী শরীরে শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রকৃতির বহু বিচিত্র অপূর্ব রঙিন কারুকাজ দেখে, মুগ্ধ হবেন সুন্দরী লেহ্‌র বুকে ইনডাসের দুরন্ত ফেনিল কলোচ্ছ্বাস দেখে, যা মুহূর্তে টেনে নিয়ে যাবে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের উপকণ্ঠে।